এম. এ. ২য় সেমেস্টার

"সংলাপ" CC-2.3

" আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ : আবু সয়ীদ আইয়ুব "

- **প্রাবন্ধিক আইয়ুব / আইয়ুবের প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য :**

[উর্দু ভাষী আইয়ুব অনুসরে 'গীতাঞ্জলি' পড়ে আকৃষ্ট হয়ে সংলাপ 'গীতাঞ্জলি' তথা রবীন্দ্রনাথ পড়তে সংলাপ লেখেন। ছাত্রজীবনের বিজ্ঞানের অসন্তুষ্টির কারণে বিজ্ঞান (পদার্থবিজ্ঞান) ছেড়ে দর্শন নিয়ে শেষ করেন উচ্চশিক্ষা, - পরবর্তীকালে প্রাবন্ধিক আইয়ুবের প্রবন্ধের ভিত্তি তৈরি হয়ে যায় এখান থেকে - বৈজ্ঞানিক যুক্তি নিষ্ঠা ও দার্শনিক বোধ - এ দুয়ের সমন্বয় তাঁর প্রবন্ধে, বিষয়ের তাঁকে নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত করে - ভাষাও হয়েছে, গড়ে ওঠে বিচার বোধ, দর্শন থেকে নৈতিকতা, এসব তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে লক্ষিত। - আইয়ুব পণ্ডিত, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ ব্যক্তিগত বোধের উপর নির্ভর, অনুভূতিও তাঁর, তাঁর প্রবন্ধ পড়া পণ্ডিতের কাজ হয় কখনও নয়, তাঁরটা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা Personal Essay. তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি আইয়ুবের প্রবন্ধে নানাভাবে প্রকাশিত, দৃষ্টি খুবই অখণ্ড, গভীর, বিশ্লেষণাত্মক, উদাহরণ দানে বিমূর্তের চেয়ে উদাহরণের দিকে বেশি ঝোঁক, বেশি যায় শ্রোতার বিদ্যাতে চলতে তিনি বেশি পছন্দ করেন।]

- আইয়ুব প্রবন্ধ লেখেন বেশি দিয়ে, যতটা না মেধা, তার চেয়ে বেশি বোধ, দর্শন, ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও অনুভূতি দিয়ে। তাঁর প্রবন্ধ তাই কেবল প্রবন্ধ নয়, যেন গদ্য গীতিকবিতা, ব্যক্তি-জীবনের প্রতিফলন সেখানে বিম্বিত নানা ভাবে, নানা রূপে।

- **আইয়ুবের রবীন্দ্র সমালোচনার রীতি বা বৈশিষ্ট্য :**

[আইয়ুবের সমালোচনা ভারতীয় দর্শন ও যুক্তিবিজ্ঞান নির্ভর, আগে অন্যের মতামত শোনেন, বোঝেন, তারপর তা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে

নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেন,

* মোহিতলাল মজুমদার : " এই দীর্ঘকালেও রবীন্দ্রকাব্যের একটি সুসংগত আলোচনা কাহারও দ্বারা সম্ভব হইল না; যে-পদ্ধতি যাহা কিছু হইয়াছে তাহাকে কোনো সাহিত্যিক আদর্শের সহায় নাই, তাহা ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস — সমালোচনা নয়, মুখালোচনা মাত্র। " — মোহিত থেকে আইয়ুব উথম পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্য সমালোচক,

* রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর বিষয়ক কবিতাকে আইয়ুব উথম একটি বিশেষ আকার দিয়েছেন,

* রবীন্দ্রকবিতার অন্তর আকাশ-বিস্তারের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি,

* অপরিমীম শ্রদ্ধা সত্ত্বেও অনুপেক্ষণ স্থলে রবীন্দ্রনাথকে কবির সমালোচনায় তিনি দ্বিধা নন,

* উপনিষদের জগৎ থেকে বের করে আধুনিক মানবিকের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি,

* রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ওঠা বহুল চলিত অভিযোগগুলোকে তিনি যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন,

" রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা "

* রবীন্দ্রনাথ আধুনিক নন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ খণ্ডনে তিনি প্রথমে আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণের কথা বলে, তার সূচনা দেখিয়ে — বোদলেয়ার থেকে — রবীন্দ্রনাথের কবিতার সূচনার থেকে কেমন ভাবে ছিল — কবিতাগুলো পর্যায়ক্রমে ধরে ধরে তা দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথকে কেতা মতানো তাঁর লক্ষ্য নয়, ব্যক্তিগত জীবন থেকে কাব্য কাব্যের তাঁর প্রকৃতি খুঁজেছেন, " সেই রবীন্দ্রনাথকে আমি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছি যিনি দুঃখের ধন, সত্যের ধন হয়েও,

Scanned with CamScanner

অমরত্বের বাণী, অমৃতের বাণী।" [সত্যের সন্ধানে]

* অমঙ্গলের বীজ তার সর্বাঙ্গে,
রাষ্ট্রযন্ত্রে তার প্রতিফলন॥

"পাথরের নগর"
আবু সয়ীদ আইয়ুব,

* বিষ্ণু সহায়ের চিত্রের অনুশীলনি দেওয়া হলো,
এছাড়া আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর 'পাথরের নগর'
'পথের শেষ কোথায়' - গ্রন্থদুটি
লেখা হয়েছে,

Scanned with CamScanner

প্রাবন্ধিক আবু সয়ীদ আইয়ুব : স্রোতের বিপরীতে

রমাপ্রসাদ দে

"প্রথমে উর্দূতে এবং পরে ইংরেজিতে 'গীতাঞ্জলি' পড়ে মুগ্ধ হয়ে মূল বাংলা ভাষার 'গীতাঞ্জলি' পড়বার দুর্দম আগ্রহই আমাকে বাংলা শিখতে বাধ্য করে"—কথাগুলি লিখেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। বোঝা যায় অন্তরের মধ্যেই একটা তাগিদ অনুভব করেন এই লেখক, অনূদিত কবিতাগুলি যদি চোখে জল আনে তেরো বছর বয়সি এই পাঠকের, তাহলে মূলের গভীরতা ও সৌন্দর্য আরও কত না সুদূরসঞ্চারী। ছন্দ মিলের বাংলা কবিতাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন স্পন্দিত গদ্যে, ইংরেজি সেই অনুবাদ থেকেই বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে কবির গীতালেখ্য। চিন দেশে যেমন গীতাঞ্জলি থেকে তরুণ কবিরা প্রেরণা পেয়েছিলেন গদ্যকবিতা লেখার, তেমনি উর্দূতেও নেয়াজ ফতহ্‌পুরীর অনুবাদ থেকেই আধুনিক উর্দূ গদ্যকবিতার তথা নসর-শায়েরির সূত্রপাত। মূল গীতাঞ্জলি পড়ার দুর্মর আগ্রহ যাকে বাংলা শিখতে প্রাণিত করেছিল তিনি কীভাবে বাংলা শিখলেন আমাদের সেই কৌতূহলেরও কিছু উত্তর আমরা পেয়ে যাই তাঁর লেখা থেকেই। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় আর মিল্‌ন সাহেবের ইংরেজি ভাষায় লেখা বাংলা ব্যাকরণ তাঁর সহায় হয়েছে। দু টাকা মাসিক চাঁদা দিয়ে তালতলা পাবলিক লাইব্রেরির সদস্য হয়েছিলেন তিনি। সেখানে শরৎচন্দ্র, সীতাদেবী, শান্তাদেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া প্রমুখ কথাশিল্পীর গল্প উপন্যাস পড়েছেন। নিজে থেকেই কিনেছেন রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ও গোরা। ভাষাশিক্ষার দিক থেকে সবচেয়ে উপকৃত হয়েছেন গোরা উপন্যাস পাঠ করে। একবার নয় চারবার পড়েছেন বইটি। "প্রথম পাঠের বেলায় ভাষা থাকে স্বচ্ছ কাঁচের মতন, সেটা ভেদ করে আমাদের দৃষ্টি চলে যায় বক্তব্য বিষয়ের দিকে। দ্বিতীয় পাঠের বেলায় কাঁচটিকে ঈষৎ অস্বচ্ছ করে আমি যে-সব শব্দের সঠিক অর্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলাম না, অভিধান ঘেঁটে এবং অনুবাদকের সাহায্য নিয়ে সেই অর্থটি ইংরেজিতে লিখে রাখলাম; বাক্যরচনারীতি লক্ষ করলাম এবং সন্ধি সমাস প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে পড়লাম। তৃতীয় পাঠের বেলায় মনকে সম্পূর্ণ ভাষার দিকে নিবিষ্ট করা সম্ভব হলো; চতুর্থ পাঠের বেলা আরও বেশি।" একজন সংবেদী পাঠক হিসাবে এখানে তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতায় তৃপ্তি খুঁজে নিতে পারতেন তিনি। কিন্তু আমরা পুলকিত হয়ে লক্ষ করি উর্দূর তুলনায় এই নতুন শেখা ভাষা তাঁর কাছে অধিকতর প্রিয় হয়ে উঠল, উর্দূ ভাষার জন্মভূমি থেকে বাংলা ভাষায় তার জন্মান্তর হল।

তিনি শুধু রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠে নিমগ্ন হলেন তাই নয়, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পরানসখা পথিকবন্ধু করে নিলেন। "পথিকদের পথক্লান্তি নেই।/প্রেম পথও বটে, গন্তব্যও (মনজিলও) বটে।" হাফিজের এই দুটি পঙ্‌ক্তির অনুরণন শুনতে পেলেন রবীন্দ্রনাথের

Scanned with CamScanner

গানে—"পথে চলা সেই তো তোমায় পাওয়া।" উর্দু ভাষায় তিনি কোনো বই লিখেছিলেন কি না, বর্তমান আলোচকের তা জানা নেই, কিন্তু চারটি বাংলা ভাষায় লেখা বই (তিনটি জীবনকালে প্রকাশিত, একটি মরণোত্তর) আর ইংরেজিতে লেখা তিনটি বই তাঁর গভীর মনন ও মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর বহন করে। বিদ্যায়তনিক বর্ণনামূলক আলোচনার গতানুগতিক পথ থেকে সরে এসে তিনি বিশ্লেষণমূলক স্বপ্রভ যে গদ্যরচনা উপহার দিলেন রবীন্দ্রসাহিত্য সফরে তা অভিনব বললে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনায় তিনিই প্রথম রবীন্দ্র সাহিত্যতত্ত্বের একটি পূর্ণায়ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। একদা মোহিতলাল মজুমদার আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, "এই দীর্ঘকালেও রবীন্দ্র-কাব্যের একটি সুসংগত আলোচনা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইল না; এ-পর্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছে তাহাতে কোনো সাহিত্যিক আদর্শের সন্ধান নাই, তাহা ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস—সমালোচনা নয়, সুখালোচনা মাত্র।" মোহিতলাল কথিত সেই শূন্যতা যে আইয়ুব পূরণ করেছেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কোথায় তার মৌলিক বীক্ষণ তা সোনার জলে লেখা মুষ্টিমেয় কয়েকটি গ্রন্থ পাঠে আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রত্যয় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা : সঞ্চয়িতার প্রথম কবিতায় 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান' আর তিরোভাবের অব্যবহিত পূর্বে লেখা কবিতায় মরণ 'দুঃখের পরিহাসে ভরা'—কালগত এই দীর্ঘ ব্যবধানে মৃত্যুর রূপগত পরিবর্তন লক্ষ করি আমরা, গুণগত নয়। ষাট বছরের বেশি সময় ধরে তিনি শুভবাদী, অদ্বয়বাদী প্রত্যয় থেকে কাব্য রচনা করেছেন। সে চৈতন্য সর্বত্র এজিত, কম্পিত—বস্তুবিশ্বে, মানববিশ্বে তার ভেদ নেই, আর সেই বিশুদ্ধ চৈতন্য থেকে তাঁর কাব্যধারা উৎসারিত। যেহেতু এই প্রত্যয় জীবনের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে অর্জিত নয়, তাই ট্র্যাজিক চেতনাও সেখানে অনুপস্থিত। অথচ আমরা যখন আইয়ুবের রচনাবলি পাঠ করি তখন এর বিপরীত কথাই শুনি। 'পথের শেষ কোথায়' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন বহির্জগতের অভিঘাতে রবীন্দ্রমানসে তথা রবীন্দ্রকাব্যে তিন রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে—

১. আশার আলোকিত উদ্ভাস
২. আশা-নিরাশায় দোদুল্যমানতা এবং
৩. গভীর তিমিরে দিশাহারা ব্যাকুলতা

আইয়ুব দেখিয়েছেন এই তৃতীয় বর্গের প্রতিক্রিয়া থেকেই রবীন্দ্র মানসের ট্র্যাজিক চেতনার প্রকাশ। অ্যারিস্টটলের অর্থে ট্র্যাজেডির শিল্পরূপের কথা বলেন না আইয়ুব। রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কবিতায় তিনি লক্ষ করেন ট্র্যাজিক চেতনার প্রকাশ। জনৈক আলোচক লিখেছেন :

'The most obvious difference I would mark between the two is also a crucial one; "tragedy" refers to an object's literary form, the "tragic vision" to a subject's psycology, his view and version of reality.'

Literary form নয় বরং tragic vision-কেই অনুধাবন করেছেন আইয়ুব রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কবিতায়। প্রত্যয়ী উচ্চারণে তিনি বলেন, "শেষ পর্বে

রবীন্দ্রনাথের প্রধান ভাব ট্র্যাজিক চেতনা। অল্প সংখ্যক কবিতায় ব্যক্ত হলেও প্রধান, 'পরিশেষ' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত কাব্যগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলে এই ভাবটাই সবচেয়ে গভীর রেখাপাত করে আমাদের মনে, অন্তত আমার মনে।" দৃষ্টান্ত হিসাবে এই ট্র্যাজিক চেতনার একটি অত্যুৎকৃষ্ট প্রকাশ তিনি লক্ষ করেছেন সেঁজুতির তীর্থযাত্রী কবিতায়। এক বৃদ্ধার ছবি আঁকা হয়েছে এই কবিতায়। হাতে তার নামজপ-ঝুলি আর পাশে পুঁটলি নিয়ে 'জীবনের পথে শেষ আধক্রোশটুকু' পার হবার জন্য তার সারাদিনের প্রতীক্ষা। সে বসে আছে মফঃস্বলের কোনো এক ছোটো স্টেশনে। ট্রেন আসবে আর সেই ট্রেনে সে পৌঁছে যাবে কোনো এক তীর্থে।

পরিত্যক্ত একা বসি ভাবিতেছে, পাবে বুঝি দূরে
সংসারের গ্লানি ফেলে স্বর্গ-ঘেঁষা দুর্মূল্য কিছুরে।
হায়, সেই কিছু
যাবে ওর আগে আগে প্রেতসম, ও চলিবে পিছু
ক্ষীণালোকে, প্রতিদিন ধরি-ধরি করি তারে
অবশেষে মিলাবে আঁধারে।

অখ্যাত গ্রামের অজ্ঞাত এই মানবী একদিন হয়তো যৌবনের পাত্রে পেয়েছিল কিছু, দিয়েছিল কিছু, কিন্তু সে পাত্র এখন শূন্য। নিকট ভবিষ্যতে এই তীর্থযাত্রিণীর মৃত্যু ঘটবে কেবল রিক্ততার মধ্যে, শূন্যের পেছনে ছুটতে ছুটতে। তার অবসন্ন জীবনের ক্ষীণালোক ক্ষীণতর হবে, অবশেষে মিলাবে আঁধারে। আইয়ুব প্রশ্ন তুলেছেন : 'মানুষের সাধারণ, সব মানুষের, তীর্থযাত্রা গোড়া থেকেই ব্যর্থতার অভিশাপ বহন করে চলেছে, তার সব অন্বেষণই মরীচিকা-অন্বেষণ?' তিনি লেখেন, 'স্বর্গ ঘেষা দুর্মূল্য কিছু কোথাও নেই, তার উপচ্ছায়া শুধু দেখা যায় সামনে, অথচ বেশ খানিকটা দূরে। এ দূরত্ব কখনই হ্রাস পাবে না, আমরা যতই এগিয়ে যাই না কেন, প্রেতচ্ছায়াটি সরে যাবে তত দূরেই।' আইয়ুব এই ট্র্যাজিকে চেতনায় সার্ত্র-এর ভাবনার সমান্তরতা লক্ষ করেছেন। সার্ত্র-এর কথায়—man is a useless passion। অসাধ্যের পেছনে ছুটে ছুটে আয়ু ক্ষয় করবে—এই তো মানব-জন্ম। সব পথ শেষ পর্যন্ত মিশে যায় একটি পথেই—যার কোনো শেষ নেই, উদ্দেশ্য নেই। আমাদের মনে হতে পারে আইয়ুবের এই ব্যাখ্যা কতটা রাবীন্দ্রিক, না কি আইয়ুব তার নিজস্ব ভাবনার সমান্তরতা খুঁজে পাচ্ছেন রবীন্দ্র কবিতায়—যেখানে তাঁর প্রিয় কাব্যলোক স্রষ্টা ও ব্যাখ্যাতার যৌথ সৃষ্টি।

'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' আবু সয়ীদ আইয়ুবের একটি উজ্জ্বল গ্রন্থ। বইটির ইতিবাচক দিক চমৎকারভাবে উদঘাটন করেছেন অরুণকুমার সরকার। আমরা তার আলোচনার উপসংহার এখানে তুলে ধরতে চাই। তিনি লিখেছেন, 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ প্রধানত রবীন্দ্রমানস-বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস। এই ইতিহাস-রচনায় আইয়ুব অসামান্য পরিশ্রম করেছেন। রবীন্দ্রচিন্তা-প্রবাহের উপর দিনরাত্রি একা-একা নৌকা বেয়ে, একটির পর একটি কবিতাকে দর্শনের আলোয় বিশ্লেষণ এবং উদ্‌ঘাটন করে যে-

Scanned with CamScanner

রবীন্দ্রনাথকে তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন তিনি শুধু বিরাট বা মহৎ নন, সদা-সংবেদনশীল আত্মনির্ভর এক দুঃসাহসী মানুষ; কামু-বর্ণিত সিসিফাসের ছবি বারবার চোখের উপর ভেসে ওঠে। বস্তুত, পাঁচটি কারণে আইয়ুবের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে চাই; এক, রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবিষয়ক চিন্তাকে তিনি একটি বিশ্বাস্য আকার দিতে পেরেছেন যা এতদিন অধ্যাপকদের অক্লান্ত চেষ্টায় নিরবয়ব ধোঁয়াটে হয়েছিল; দুই, রবীন্দ্রচিন্তার অনেক আপাত-বিরোধিতার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা তাঁর গ্রন্থেই প্রথম পাওয়া গেল; তিন, রবীন্দ্রনাথের শেষ-পর্বের রচনার একাধিক দার্শনিক রহস্য তিনি উন্মোচন করতে পেরেছেন যা একমাত্র তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব ছিল; চার, অপরিসীম শ্রদ্ধা সত্ত্বেও প্রয়োজনস্থলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-বিশেষকে তিনি কঠোর সমালোচনা করতে ইতস্তত করেননি; পাঁচ, বিশেষ নজরে পড়েনি রবীন্দ্রনাথের এমন একাধিক ভালো কবিতার প্রতি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উপনিষদের আলোয় রবীন্দ্রনাথকে অনেকদিন ধরে দেখে আসছি আমরা। এই প্রথম একজন, আধুনিক দার্শনিকের দৃষ্টিতে কবিকে দেখার সুযোগ হল।'

দুঃখ ও পাপের যুগ্মসত্তাকে ইংরেজিতে evil নামে অভিহিত করা হয়। আইয়ুব তার পরিভাষা করেছেন অমঙ্গল। লক্ষ করেছেন আধুনিক সাহিত্যের উপর এই অমঙ্গলের ছায়া বৃহৎ আকার ধারণ করেছে। ফ্রান্সে ভিক্টর উগো এবং ইংলন্ডে লেক স্কুলের কবি-গোষ্ঠীর কলমে যে রোম্যান্টিকতা পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার অবসান ঘটল এই অমঙ্গলবোধের প্রবল অভিঘাতে। এই প্রাবাল্য যার কবিতায় প্রথম রণিত হল তিনি বোদলেয়র। তাই বোদলেয়রকে বলা হল প্রথম আধুনিক কবি অর্থাৎ আধুনিকতার সঙ্গে সমীকৃত হল অমঙ্গলবোধ। 'বোদলেয়রের পদ্যরীতি ও শব্দ বিন্যাস ছিল বৈপ্লবিকভাবে নূতন', এলিয়ট লিখেছেন, 'জীবনবোধে যে নূতনত্ব তিনি এনেছেন তা আরও মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ।' রোম্যান্টিক বিস্ময়ের বদলে এক সর্বগ্রাসী বিতৃষ্ণায় বলয়িত ছিলেন বোদলেয়র। এই বিতৃষ্ণার চারটি কারণ নির্দেশ করেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব।

প্রথম কারণ, যদিও পরিবেশ গুণে তিনি ছিলেন রোম্যান্টিসিজমের সন্তান, কিন্তু স্বভাবগুণে রোম্যান্টিসিজমের শত্রু। তার কাউন্টর-রোম্যান্টিসিজমের মূলে ছিল বিশ্ববিতৃষ্ণা।

দ্বিতীয় কারণ বিষয়ীগত (subjective), কবির দেহমনের মধ্যেই ছিল জাগতিক বিতৃষ্ণার উপাদান। বোদলেয়র তরুণ বয়স থেকে গ্লানিকর দুরারোগ্য রোগে ভুগেছেন। উপরন্তু তার মানসিক কষ্টেরও অবধি ছিল না।

তৃতীয় কারণ হিসাবে আইয়ুব নির্দেশ করেন, বোদলেয়রের বিশ্ববিতৃষ্ণা কেবল সাবজেক্টিভ নয়, অবজেক্টিভ-ও বটে। 'পরিণত বয়সেও' বোদলেয়র বলেছেন, 'এমন শৈশবের দিন মাঝে মাঝেই ফিরে আসে, যখন প্রকৃতি রঙে ও রেখায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে...'। এই উজ্জ্বল মুহূর্তগুলি, বোদলেয়রের ধারণায়, কবির পক্ষে শুভদিন নয়, কারণ তা মিথ্যাশ্রয়ী। কবিকে দাঁড়াতে হবে নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি।

এবার চতুর্থ কারণ। খ্রিস্টধর্মের সংস্কার অনুযায়ী মানুষের সামনে খোলা আছে দুটি পথ—একটি গেছে ভগবানের দিকে, অন্যটি শয়তানের। বোদলেয়র পা বাড়ালেন দ্বিতীয় পথে। পঙ্কের সাধনায় বোদলেয়র উপহার দিলেন কয়েকটি অপূর্ব সুন্দর পঙ্কজাত পুষ্প : Fleurs du Mal।

মঙ্গলে পরিপূর্ণ আস্থা ছিল বলেই অমঙ্গলের সাধনা করেছিলেন তিনি, বোদলেয়র-অনুরাগীদের এই ধারণা সমর্থন করেন না আইয়ুব। 'বোদলেয়রের কবিতায় কোনো সদর্থকভাব বা ইঙ্গিত আবিষ্কার করতে গেলে কষ্টকল্পনার উপর নির্ভর করতে হয়'—এরকম ভাবেন তিনি। শূন্যতা, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, বিবমিষা এবং জীবনের অর্থহীনতা—বোদলেয়রের কবিতাবিশ্ব এই নঞর্থক উপাদানে সংরচিত। কীটস্, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, রিলকে, ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট, তলস্তয়—এঁরা এই পৃথিবীর কালো দিক সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন এমন নয়, কিন্তু তাঁদের মনের গতি ছিল অন্ধকার উত্তীর্ণ হয়ে আলোকে প্রত্যক্ষ করা। অন্তত আলো অন্ধকারের একটা ভারসাম্য তাঁদের রচনায় লক্ষ করা যায়। কিন্তু বোদলেয়র, কাফকা, ফকনার, জাঁ জেনে, সার্ত্র—বিতৃষ্ণা বা বিবমিষার প্রকাশে অকুণ্ঠিত, 'কালোকে যত বেশি কালো এবং সাদাকে যত অদৃশ্য করে দিতে পারেন' ততই তারা সত্যদ্রষ্টা ও আধুনিক অভিধায় চিহ্নিত হন। আইয়ুবের প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুধুই কি আলোর উৎসব, নেই কি সেখানে তিমির-তিক্ত অভিজ্ঞতা? অবশ্যই জীবনকে ঘৃণা করতে শেখান না রবীন্দ্রনাথ, তবে অমঙ্গলবোধ যদি হয় আধুনিকতার চিহ্নায়ক, তাহলে তার ছায়া-প্রচ্ছায়া রবীন্দ্রনাথেও পরিলক্ষ্য, এমনটাই বলতে চান আইয়ুব। প্রচলিত ধারণা : একালের তিমিরাচ্ছন্ন দেশকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের দূরত্ব দিগন্ত-দীর্ঘ। সুধীন্দ্রনাথ যেমন বলেন 'রবীন্দ্রসাহিত্যে যে-দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাদের সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে উভয়ের যোগফলকে যদি পরীর রাজ্য বলা যায়, তাহলে বিস্ময় প্রকাশ অনুচিত'। আইয়ুব কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যধারায় নৈরাশ্য ও অমঙ্গলবোধ কি ভাবে পরিব্যপ্ত হয়ে আছে তা আজকের দিনের পাঠকের সামনে নিয়ে আসেন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'প্রকৃতির প্রতি', 'সিন্ধুতরঙ্গ', 'শূন্যগৃহে' আর 'জীবন মধ্যাহ্নে'র মতো কবিতায় উজ্জ্বলতা নয় দুঃখ কালিমাকেই দেখেন তিনি। 'সোনার তরী'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় 'বিদেশিনী'কে নিয়ে ভাবিত হন না, প্রত্যক্ষ করেন 'সংশয়ময় ঘন নীল নীর'—যেখানে 'অসীমরোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন'। 'চিত্রাকাব্যে'র 'জীবনদেবতা' তাঁর কাছে গুরুত্ব পায় না কিন্তু অনালোচিত 'সন্ধ্যা' কবিতাটিকে তিনি সামনে নিয়ে আসেন। 'সন্ধ্যা' কবিতার আদ্যন্ত ক্লিষ্ট বিষাদের সুর, সেখানে 'গতিবোধ কোনো উচ্ছ্বাস জাগায় না, জাগায় শুধু নৈরাশ্য আর বিষাদ'। 'কল্পনা'র 'দুঃসময়' কবিতায় লেখক দেখেন, 'সমস্ত পৃথিবীর বিষণ্ণ অবসাদ যেন কবি টেনে নিয়েছেন নিজের মধ্যে, নিজের দুটি ক্লান্ত ডানার মধ্যে'। তবে আধুনিক যুগের যে সংশয় ও যন্ত্রণার কথা বলতে চান আইয়ুব, রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কবিতার মধ্যেই তা অনেক বেশি প্রত্যক্ষ, 'গীতিঞ্জলি'র রবীন্দ্রনাথকে আর চেনা যায় না তখন। মৃত্যুর কয়েকমাস আগেও তিনি লিখতে পারেন :

Scanned with CamScanner

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;
সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।

উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে স্পিনোজাভক্ত আইয়ুব শুনতে পান দার্শনিকের এই উপলব্ধির উচ্চারণ : The truth is cruel but it can be loved, and it makes free those who have loved it'। তাঁর 'পান্থজনের সখা'য় আইয়ুব লেখেন, 'কবিতার সত্য ও সুন্দর অভিন্নার্থ। ভয়ংকরের সঙ্গে তার বিরোধ নেই। 'কিং লিয়র'-এর মতো ট্র্যাজিডিকেও আমরা সুন্দর বলি, যত মর্মান্তিক হোক তার ঘটনা-পরম্পরা, কালবৈশাখীর বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ কালো আকাশও সুন্দর।' অবশ্য স্পিনোজার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য বিষয়েও তিনি সচেতন। 'Tagore's quest' বইটিতে তাই লেখেন, 'If Tagore had achieved the serenity of mind, he would have been a great mystic like Kabir or a great philosopher like Spinoza, but only a minor poet. For great poetry is born of severe tensions, and dies with the resolution of those tension'. গানের একটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে দিয়ে এই সত্যকে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ—'অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে'। এ পৃথিবীতে দুঃখ আছে, মৃত্যু আছে তবু এই নাস্তিকে অতিক্রম করেই (অস্বীকার করে নয়) রবীন্দ্রনাথ পৌঁছে যান মঙ্গলবোধে। এই প্রত্যয় থেকেই আইয়ুব বলতে পারেন, 'সেই রবীন্দ্রনাথকে' আমি অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছি যিনি দুঃখের কবি মৃত্যুর কবি হয়েও আনন্দের কবি, অমৃতের কবি'। দ্বন্দ্বদীর্ণ অথচ অমৃত-সন্ধানী এই কবিকেই চিনিয়ে দেন আইয়ুব। আর এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ যে একজন আধুনিক কবি এ কথাটাও ঘোষণা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আইয়ুবের চিন্তাজগৎ গড়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য দর্শনে অববাহিত হয়ে। মার্কসীয় চিন্তাধারা এবং হোয়াইটহেডের বিবর্তনবাদ তাকে অনুপ্রাণিত করে। তবে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ছিলেন সম্ভবত স্পিনোজার ধর্ম ও গণতন্ত্র ভাবনায়। আর ভারতীয় দর্শনে কতটা তিনি অনুপ্রবিষ্ট ছিলেন আমরা জানি না; রবীন্দ্র সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে দার্শনিক ভাবনা তিনি অর্জন করেছিলেন, সাহিত্য বিধৃত সেই দর্শনকেই তিনি ভারতীয় দর্শনের অন্তঃসার মনে করতেন। গভীরতর অর্থে যা রাবীন্দ্রিক।

রবীন্দ্রসাহিত্যের আকর্ষণেই তিনি বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় জন্ম নিয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সবকিছুই যে পরমোৎকর্ষ সংরচনা, এমন্ মনে করতেন না আইয়ুব। দৃষ্টান্ত হিসাবে রবীন্দ্রনৃত্যশিল্পের উল্লেখ করতে পারি। 'শ্যামা'কে নৃত্যনাট্য বলতে চান না আইয়ুব। তার কারণ হিসাবে লিখেছেন—

'শ্যামাকে নৃত্যনাট্য বলছি না শুধু এই কারণে যে কাব্যে ও সংগীতে রবীন্দ্রনাথের

সৃজনী-প্রতিভা এবং আঙ্গিকসিদ্ধি যেমন অনন্য ছিল, তার তুলনায় শতাংশের একাংশও নৃত্যকলাবিৎ ছিলেন না তিনি। শ্যামা-তে কথা ও সুরের মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে, কিন্তু নৃত্যকে মনে হয় অসম প্রতিদ্বন্দ্বী। রঙ্গমঞ্চে যতবার শ্যামা দেখেছি, আমার মনে হয়েছে নৃত্যের অংশটা বাদ দিলেই ভাল হত। বিশেষত কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন শ্যামার গানগুলি তাঁর অপূর্ব কণ্ঠে অনবদ্য আঙ্গিকে গেয়ে যান তখন দুঃখের সঙ্গে ভাবি সেই গীত-মাধুরীকে নৃত্যরূপ দান করতে পারেন এমন নৃত্যশিল্পী কোথায়। যতদিন না রবীন্দ্র-কাব্যে সহৃদয়া অথচ নৃত্যকলায় পূর্ণসিদ্ধা কোনো শিল্পীর আবির্ভাব হচ্ছে এ পার বা ও-পার বাংলায় ততদিন নৃত্যনাট্য শ্যামার নৃত্য ভাগটা রসিকবৃন্দের কল্পনাতেই প্রতীক্ষামান থাকবে। বিশেষ করে শ্যামার, কারণ শ্যামা যে রাজনটী; সাধারণ কোনো নৃত্যসাধিকা তার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন দেখলে না-ভেবে পারি না যে ভারসাম্য বা রসসাম্য রক্ষা পায়নি। তা ছাড়া শ্যামার মতো অতুলনীয় সৃষ্টির রূপায়ণে সামান্য ত্রুটি ঘটলেও মনে হয় যেন দেবমূর্তি অসম্মানিত হয়েছে।'

শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন আইয়ুব। তিনি জানতেন নির্জনতা-বিলাসী শিল্পীর দিন আজ অস্তমিত। পুরাতন সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, নতুন সমাজের পলি জেগে উঠছে সময়সমুদ্রে। নবজাতকের সঙ্গে নরঘাতকের চলছে শক্তির পরীক্ষা। পৃথিবীব্যাপী এই রণরঙ্গভূমিতে শিল্পীকেও যথাযোগ্য স্থান নিতে হবে। কারণ শিল্পী নীহারিকাবাসী নন, এই পৃথিবীর মানুষ। যারা 'মাঠে মাঠে/বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে'—তাদের সঙ্গে শিল্পী সাহিত্যিকরাও অচ্ছেদ্যসূত্রে বাঁধা। নতুন দিনের মানুষ গড়ার স্বপ্ন ছিল লেনিনের চোখে। তাই একদা তিনি বলেছিলেন, 'Down with non-party writers! Down with literary supermen! Literature must become a part of the proletarian cause as a whole, part and parcel of a single whole, of the entire social mechanism set in motion by the whole conscious vanguard of the entire working class. Literature must become an integral part of an organised, planned, united, social-democratic party work'.

ত্রিশ বছর পরে কমিনটার্নের বরেণ্য নেতা ডিমিট্রিয়ফ সাহিত্যিকদের ডাক দিয়ে বলেন,

'Help us, help the party of the working class,
the commintern—give us a keen weapon
in artistic from—in poetry, novels and short
stories—to use in this sturggle.'

'ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক' গ্রন্থের 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য' শীর্ষক প্রবন্ধে আইয়ুব লিখছেন,

'এই মহৎ আবেদনে সাড়া দিয়েছেন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বহু শক্তিমান সাহিত্যিক ও শিল্পী। সে-সাড়ার ঢেউ এসে আমাদের দেশেও লেগেছে। বাংলা সাহিত্য নতুন প্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়েছে, বেগবান হয়েছে। এত বড়ো

Scanned with CamScanner

কাজে আমাদের শিল্পীরা তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়ে এসে দাঁড়াবেন দেশকর্মী ও সমাজসেবীর পাশে, তাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগুবেন এবং তাঁদের এগিয়ে নিয়ে যাবেন, সে তো সর্বৈব আনন্দ ও গর্বের কথা।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা আশঙ্কাও জেগেছে আইয়ুবের ভাবনায়, যেখানে তিনি দেখছেন পার্টি-অনুগত রচনাকেই শিল্প সাহিত্যের সর্বপ্রধান, এমনকি তার একমাত্র, সার্থকতা বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। সাহিত্য বিপ্লবী দলের ধারালো অস্ত্রে পরিণত হোক, মানবদরদী পাঠক তাতে আপত্তি করবেন না। 'ফলিত সাহিত্যের ভূয়সী প্রচারকে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাব', জানাচ্ছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, কিন্তু 'বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রতি আমাদের যে অন্তরতম অনুরাগ আছে সেটাকে যেন ব্যাহত হতে না-দিই তার জন্য বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল, ডেকেডেন্ট—যত গালাগালি দেওয়া হোক সমস্ত সহ্য করবার মতো মহৎ বেহায়াপনা যেন আমাদের থাকে।'

—এভাবেই স্রোতের বিপরীতে আমরা পেয়েছি আইয়ুবকে, কী রবীন্দ্রসাহিত্য বিশ্লেষণে, কী ধর্মভাবনায় কিংবা শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে। ঋদ্ধিমান, হৃদয়বান, মুক্তবুদ্ধি এই মানুষটিকে আমরা বারংবার নমস্কার জানাই।

Scanned with CamScanner

প্রাবন্ধিক আবু সয়ীদ আইয়ুব

তরুণ মুখোপাধ্যায়

Scanned with CamScanner

প্রাবন্ধিক আবু সয়ীদ আইয়ুব

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় (১৯৩৪) তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, আবু সয়ীদ আইয়ুবের (১৯০৬—১৯৮২) বয়স তখন ২৮ বছর। আর তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ গ্রন্থ 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৮) যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর বয়স ৬২ বছর। প্রৌঢ় বয়সে লেখক সত্তার এই উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছিল রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) ক্ষেত্রেও। মৌলিক প্রবন্ধগ্রন্থ (ইংরেজি ও বাংলা), সম্পাদনা নিয়ে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের সময়সীমা ১৯৬৮ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত।

জন্মসূত্রে অবাঙালি। ফার্সি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। উর্দুই ছিল মাতৃভাষা। উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কৈশোরে পড়ে, তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী হন। তাঁর 'ভাষা শেখার তিন পর্ব এবং প্রসঙ্গত' লেখায় বলেছেন—

> ইংরেজিতে 'গীতাঞ্জলি' পড়ে মুগ্ধ হয়ে মূল বাংলা ভাষায় 'গীতাঞ্জলি' পড়বার দুর্দম আগ্রহই আমাকে বাংলা লিখতে বাধ্য করে। (পথের শেষ কোথায়)

পরিণত বয়সে মার্ক্সীয় দর্শন ও তত্ত্ব তাঁকে অণুপ্রাণিত করেছিল। যদিও মার্ক্সবাদে অন্ধ অনুরাগ তাঁর ছিল না। রাজনীতি সচেতন হলেও তাঁর দীক্ষা ছিল দর্শনে। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা শুরু করলে-ও অসুস্থতার জন্য পরে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স, এম.এ. করেন। তবু সাহিত্যই তাঁর আশ্রয় এবং রবীন্দ্রনাথ পরমাশ্রয়। তাঁর স্বীকারোক্তি—

> স্থির করলাম সাহিত্যই হবে আমার প্রধান কর্মক্ষেত্র; অর্থাৎ লেখার প্রধান বিষয়। (তদেব)

কলকাতার বাসিন্দা হয়ে উর্দু ও ইংরেজিতে লিখে খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা পাবেন না, বুঝেছিলেন। তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেই তাঁর চর্চার বিষয় হয়েছিল। এবং 'আমার চোখ তো আমি অনেকটাই পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে', তিনি স্পষ্টই বলেন। তবে এটাও সত্য, তাঁর ভাষায় 'অনেক মহোচ্চবর্ণ-ধনিকের কাছে আমি অধমর্ণ।' (তদেব)

আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রবন্ধের প্রধান বিষয় রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক বাংলা কবিতা। রবীন্দ্রকাব্যে-গানে তিনি শান্তি ও সুন্দরের মরূদ্যান খুঁজে পেয়েছেন। এর শুভবোধে উজ্জীবিত হয়েছেন। যা আধুনিক কবিদের কবিতায় নেই। আইয়ুব দেখেছেন, বুদ্ধদেব বসুর বোদ্‌ল্যার আলোচনা ও অনুবাদ রবীন্দ্রোত্তর কবিদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি বলেন,

> ...রীতিমতো একটি বোদলেয়র cult গড়ে উঠেছিলো পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে। দেখে আমি দুঃখিত বোধ করলাম। (তদেব)

বোদল্যার-এর কাব্যে ও ভাবনায় তিনি খুঁজে পেলেন 'একান্ত একপেশে বা একদেশদর্শী' দৃষ্টিভঙ্গি। যে বিষাদ-ক্লান্তি-কুশ্রীতা বোদল্যার কবিতায় দেখান তা আইয়ুবের অপছন্দ। কেননা তিনি অসুন্দর নন, সুন্দরের উপাসক। হতাশা নয়, আশাবাদে তাঁর আস্থা। নিজেকে 'নাস্তিক' বললেও, প্রেমই যেন তাঁর ঈশ্বর। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচিন্তা ও উপনিষদের ঈশ্বরভাবনা মিলে যে অস্তিক্যচেতনা, তা নিয়ে আইয়ুব বিচলিত নন। এক মঙ্গলময় সুন্দরকে রবীন্দ্রনাথ খোঁজেন—সেই তাঁর পরানসখা, বন্ধু, জীবনদেবতা। জীবনের শেষপ্রান্তে যে চরম ও পরম সত্যকে তিনি জেনেছিলেন, তা এইরকম—

Scanned with CamScanner

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম;
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলামা
আপনার রূপ—
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—
সে কখনো করে না বঞ্চনা। (শেষ লেখা)

অপারেশন টেবিলে ওঠার মুহূর্তেও জেনেছেন সৃষ্টির পথ ছলনাজালে ঢাকা, তবু 'সহজ বিশ্বাস' যার আছে, 'সত্যেরে সে পায়

আপন আলোক-ধৌত অন্তরে অন্তরে।' (শেষ লেখা)

তবু 'প্রথম দিনের সূর্য'র রহস্য অজানাই থেকে গেল। গানে হয়তো তাই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নদীর্ণ—'পথের শেষ কোথায়, কী আছে পথের শেষে?' আইয়ুব গীতাঞ্জলি-র রবীন্দ্রনাথকে এর সঙ্গে মেলাতে পারেননি। তবে এক বিস্ময়বোধে উদ্দীপিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মহাবিশ্বে মহাকাশে তাঁর পরিভ্রমণ সেই বিস্ময় নিয়েই। আব্রহ্মভুবন জুড়ে সেই আনন্দ উপলব্ধিই তাঁকে সংশয় ও নৈরাশ্য থেকে বাঁচিয়েছে।—

আকাশ ভরা সূর্যতারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
* * * * *
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

ঠিক এই বোধ-ই আইয়ুবকে ক্ষয়িষ্ণু নাস্তিকতা থেকে বাঁচিয়েছে। তথাকথিত ঈশ্বরে বিশ্বাসই তো আস্তিকতা নয়। জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি, বিশ্ব-প্রকৃতিতে আস্থা ও ভালোবাসার নাম-ও আস্তিকতা। এই শিক্ষা ও দীক্ষা তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকেই পেয়েছিলেন। 'তবু অনন্ত, তবু আনন্দ জাগে' জন্ম-মৃত্যু-দুঃখ-শোক-বলয়িত জীবনে এই সত্য তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন। যেজন্য রোগজীর্ণ আইয়ুব হার মানেননি। হয়েছিলেন 'সৌম্য প্রমেথিউস'— বলেছেন মনস্বী প্রাবন্ধিক শিবনারায়ণ রায়।

রবীন্দ্রকাব্যপাঠ ও আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আধুনিকতা সম্পর্কে সচেতন হন। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-র (১৩৪৭) ভূমিকায় বলেন,

কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তি-প্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।

আধুনিক কবিদের কবিতায় তিনি কী দেখেছেন?

১. কাব্যদেহের প্রতি একাগ্র মনোনিবেশ
২. ভাষাকে প্রতীক জ্ঞান না করে দুর্ভেদ্য মহিমা দেওয়া
৩. জাগতিক অমঙ্গল বিষয়ে চেতনার আধিক্য

এর ফলে 'আধুনিক কবিতায় এসেছে অমঙ্গলবোধ। আর কবিদের মনে জগৎ ও জীবন বিষয়ে আনন্দ, আগ্রহ, শ্রদ্ধা, বিস্ময়, এমনকি কৌতূহল পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে তার জায়গা জুড়েছে বোরডম্, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, বিবমিষা।' (আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ)

প্রসঙ্গত, তিনি জানিয়ে দেন গীতাঞ্জলি বা বলাকা কাব্যের রবীন্দ্রনাথ যতই আস্তিক ও যৌবনপ্রাণিত হোন না কেন, তাঁর কবিজীবনের সূচনাপর্ব থেকে এক অন্তর্লীন বিষাদে ('সন্ধ্যা' কবিতা দ্র.) আচ্ছন্ন ছিলেন কবি। যা শেষপর্বের কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে। এখানে তিনি 'সর্বব্যাপী দুঃখ ও পাপ বিষয়ে সচেতন; 'সত্য-শিব-সুন্দরের পরমতা বিষয়ে সন্দিহান'। তবু 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' যিনি বলেন, 'বিশ্বধাতার প্রতি বিশ্বাস হারানো ভুল', এও বলতে চান। দুয়ে মিলে 'সত্য যে কঠিন'—তাকেই কবি মান্য করেছেন। 'সাধু ও সজ্জন' প্রবন্ধে আইয়ুব যা বলেছেন, এ প্রসঙ্গে তার মূল্য আছে।

সজ্জন ব্যক্তির কাছে শ্রেয়স্ হচ্ছে তার মনোগত আদর্শ, বাইরের বাস্তব অমঙ্গল ও অন্যায়ের সঙ্গে যুঝে যেটাকে ক্রমশ সত্য করে তুলতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ সেই সজ্জন ও সত্যসন্ধানী; যেমন আইয়ুব নিজেও। যেজন্য প্রচলিত ধর্ম ও অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করেন না। 'ধর্মসম্প্রদায়ের অবসান' কামনা করেন। আজীবন আইয়ুব যে দার্শনিকতা, নীতি, সৌন্দর্যভাবনা ও ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারাকে অনুসরণ করেছেন, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেখি Varities of Experience, Poetry and Truth, Tagore's Quest গ্রন্থগুলিতে। 'গালিবের গজল থেকে' (১৯৭৬) অনূদিত কবিতার ভূমিকায় তাঁকে বলতে শুনি,

হাফিজে যেমন, রবীন্দ্রনাথে যেমন, গালিবেও তেমনি নারীপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেমের মধ্যে দূরত্ব বেশি নয়.....।

প্রেমিকা ও ঈশ্বর দুই-ই আশ্চর্য স্বেচ্ছা বধির—'তুমি এক পরমাশ্চর্য না-শোনা' গালিব বলেন। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি জীবনানন্দ দাশ দেখেন, নারীরা 'সোনার পিত্তল মূর্তি', মূর্খ যুবকেরা বৃথা যার কানে প্রেমের ভাষা নিবেদন করে। তথাপি প্রেমিক হৃদয়ের কান্না, আর্তি, আকুলতা, আহ্বান সত্য হয়েই থাকে। এই ব্যাকুলতাই রোমান্টিকতা। আধুনিক কবিরা বাস্তবতার দোহাই পেড়ে যখন খুব নিরাসক্তি দেখান, আইয়ুব তা মেনে নিতে পারেন না।

তবে আইয়ুব মনে করেন, 'আধুনিক কবি যেন পরীক্ষাগারের বৈজ্ঞানিক'। যেখানে 'ছন্দ ও ছন্দোমুক্তির, সমিল ও অমিল পঙক্তির, উদ্ধৃত খন্ডিত ও বিপর্যস্ত বাক্যের, আচম্‌কা উপমার, আজগুবি অনুষঙ্গের অনভ্যস্ত প্রতীকের' নিরন্তর পরীক্ষা চলেছে। একালে পঞ্চাশ থেকে নব্বই দশকের কবিদের কবিতায় এর কিছু দৃষ্টান্ত পাই। চামচের মতো উজ্জ্বল মুখ (উৎপলকুমার বসু), মোহমুদ্গারের মতো পাছা (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়), টাটকা আলুর চপের মতো চাঁদ (শ্রীজাত) ইত্যাকার উপমা এরই ফলাফল।

আইয়ুবের নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনার প্রতিফলন পাই তাঁর 'সুন্দর ও বাস্তব' প্রবন্ধে। ক্রোচে, রবীন্দ্রনাথ-এর প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি সৌন্দর্য অনুভবের তন্ময়তাকে, অনুধ্যানকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়—

যখন আমরা একাগ্র স্তিমিত চিত্তে সুন্দরের ধ্যানে নিমগ্ন, তখন জীবনের সমাজের বহিঃসংসারের কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ তখন সেই সুন্দরের ধ্যানলব্ধ মূর্তিতে অন্তর্লীন হয়ে তাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বিত

Scanned with CamScanner

সত্তাগৌরবে গরীয়ান করে তোলে। (সুন্দর ও বাস্তব)

সাহিত্য সমালোচকরূপে নিজেকে দেখাতে তিনি রাজি নন। বরং 'রবীন্দ্রপ্রেমিক বলেই নিজের পরিচয় দিতে চাই' (নয়নে কেন আঁধি) বলেন। তাঁর 'ভাষা শেখার তিন পর্ব' প্রবন্ধে আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন,

> কয়েকজন সুধী পাঠকপাঠিকাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও নাটক একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে, এবং রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে জগৎ ও জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করতে আমি সহায়তা করেছি। হয়তো আমার চোখ দিয়েও। কিন্তু আমার চোখ তো আমি অনেকটাই পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

প্রাবন্ধিকরূপে তিনি সম্প্রদায়িকতা, অপরোক্ষানুভূতি, শ্রেয়োনীতি, সাহিত্যে যৌনতা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন। মানবধর্মে, মানবতায় বিশ্বাস রেখেছেন। ঐকান্তিক পরিশ্রমে 'চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধের ভাষা' আয়ত্ত করতে পেরেছেন, তাও বলেছেন। সুন্দর ও মঙ্গল তাঁর অন্বিষ্ট, এনিয়ে সন্দেহ নেই। 'কাব্যরচনা নিছক শব্দের আলিঙ্গন' তিনি মানেন না। কবি কোলরিজের বক্তব্যে সায় দিয়ে বলেন, 'No man was ever yet a great poet without being at the same time a profound philosopher'.

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি দেখেছিলেন, দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনার ত্রিবেণীসঙ্গম। আমার মনে হয়, আবু সয়ীদ আইয়ুবও সেই ধারার অন্যতম উত্তরসূরি। তাঁর গদ্যরীতি প্রসঙ্গে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য মনে করি। তিনি বলেছেন, আইয়ুবের গদ্য সরস এবং

> আইয়ুবের বিশ্লেষণ চমকপ্রদ, যুক্তিবিন্যাস সুপরিচ্ছন্ন, তর্ক অকাট্য, ...যা আসল কথা তা হলো অন্তর্দৃষ্টি, তা হলো গভীরতা, তা হলো ব্যঞ্জনা, তা হলো না-বলা কথার বেদনা, অথবা বলতে পারি, তা হলো সুরের সংকেত।

(গ্রন্থালোচনা / দেশ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮)

আইয়ুবের লেখায় 'পাণ্ডিত্য এবং স্বচ্ছ চিন্তাধারার যুগলমিলন' দেখেছেন কবি অরুণকুমার সরকার। এক মুক্তবুদ্ধির প্রাবন্ধিকরূপে তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, নিঃসংশয়ে তা বলা যায়।

আইয়ুবের রবীন্দ্রচর্চা প্রসঙ্গে

প্রথমে উর্দু ভাষায়, পরে ইংরেজিতে অনূদিত 'গীতাঞ্জলি' পড়েই আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রথম রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে উৎসুক হন। যথাক্রমে তেরো ও ষোলো বছর বয়সে তাঁর রবীন্দ্রকাব্য পাঠে দীক্ষা। তবে রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে ভাবনা ও চর্চা এবং লেখালেখির সূত্রপাত ১৯৬৪-তে। যার সমাপ্তি ১৯৭৭-এ। আর গ্রন্থরূপে রবীন্দ্রচর্চা বৃহত্তর পাঠকসমাজে পৌঁছায় ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' প্রকাশের পরে। ১৯৭৭-এ 'পথের শেষ কোথায়' প্রকাশিত হয়। তবে ১৯৯১-এ 'ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক' গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রবিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও লেখার কথা পাই তাঁর 'গালিবের গজল থেকে' অনুবাদের ভূমিকায় (১৯৭৬)। এছাড়াও অসংকলিত প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তাঁর ভাবনা উৎকীর্ণ হয়ে আছে। তবে তাঁর রবীন্দ্রচর্চা প্রসঙ্গে আলোচনায় বেশি ব্যবহৃত হয় তিনটি গ্রন্থ—আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৮), পান্থজনের সখা (১৯৭৩) এবং পথের শেষ কোথায় এবং পূর্ব প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ (১৯৭৭)। আর আছে Tagore's Quest নামে গ্রন্থ—যা পড়িনি। অন্য একটি লেখায় এই গ্রন্থের কথা পাই (আরতি সেন ও সুতপা ভট্টাচার্য)। তাঁরা মনে করেন, 'Tagore's quest আসলে তাঁর নিজেরই quest'। (আইয়ুবের রবীন্দ্রনাথ / সুতপা ভট্টাচার্য)।

শ্রীমতী আরতি সেন ছিলেন আইয়ুবের কাছের মানুষ। ব্যক্তি ও লেখক দুইরূপেই তাঁকে দেখেছেন। তাঁর অনুধ্যানে আইয়ুবের রবীন্দ্রভাবনা ও আলোচনার দুটি পদ্ধতি ধরা পড়েছে।

১. রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলিকে খণ্ড-খণ্ডভাবে না-দেখে তিনি এগুলিকে এক মহাকাব্যের অংশ হিসেবে দেখেছেন। মূল থিম কীভাবে পরিণতি লাভ করছে, লক্ষ্য করেছেন।
২. তিনি টয়েনবির চ্যালেঞ্জ ও রেসপন্সের কাঠামোয় ফেলে দেখাতে চেয়েছেন যে বহির্জগতের অভিঘাত রবীন্দ্রমানসে কী প্রতিক্রিয়া তুলেছিল এবং তাঁর কাব্যে কীভাবে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

আইয়ুব তিনটি ধরন খুঁজে পেয়েছেন এক্ষেত্রে—

ক. আশায় উজ্জ্বল ও মোটের উপর প্রসন্ন;
খ. আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান, আলো-আঁধারে সংকুল;
গ. গভীর তিমিরে দিশাহারা, হতাশায় ভেঙে পড়া।

(দ্র. আইয়ুব : স্মরণগ্রন্থ / মুহম্মদ সইফুল ইসলাম সম্পাদিত)

তথাকথিত ঈশ্বরের ও ধর্মাচরণে তিনি বিশ্বাসী নন। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবনায় তিনি প্রেমের মিশ্রণ দেখেছেন। প্রেমই তাঁর ঈশ্বর। যেজন্য কোনো এক বিদেশি বন্ধুকে পরিহাসের ভঙ্গিতে বলা এই কথা সত্য বলেই মনে হয়—'I have retired form God to Love'. প্রেমের বহুতী উপলব্ধি যেমন তাঁর নিজস্ব, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কাছেও তিনি ঋণী।

'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' বইটি প্রকাশের পর তার সমালোচনা করতে গিয়ে কবি অরুণকুমার সরকার বলেন, 'একটি অসাধারণ প্রকাশ'। কেন আইয়ুবের রবীন্দ্রচর্চা স্বতন্ত্র, তাও শ্রীসরকার পাঁচটি কারণ উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। দর্শনের আলোয় রবীন্দ্রকবিতার বিশ্লেষণে অভিনবত্ব কোথায়?

১. রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-বিষয়ক চিন্তাকে তিনি একটি বিশ্বাস্য আকার দিতে পেরেছেন।

Scanned with CamScanner

২. রবীন্দ্রচিন্তার অনেক আপাতবিরোধিতার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা তাঁর গ্রন্থেই প্রথম পাওয়া গেল।
৩. রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের রচনার একাধিক দার্শনিক রহস্য তিনি উন্মোচন করতে পেরেছেন।
৪. শ্রদ্ধাসত্ত্বেও প্রয়োজনস্থলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-বিশেষকে কঠোর সমালোচনা করেছেন।
৫. বিশেষ নজরে পড়েনি রবীন্দ্রনাথের এমন একাধিক ভালো কবিতার প্রতি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উপনিষদের আলোয় নয়, 'আধুনিক দার্শনিক দৃষ্টিতে কবিকে দেখার সুযোগ হলো।' (কলকাতা, ১ম বর্ষ / জুলাই, ১৯৬৮)

অধ্যাপক ও কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও মনে করেন গ্রন্থটি 'মণীষাদীপ্ত অনন্য আলোচনা'। এবং 'রবীন্দ্রনাথের ভক্তিগীতির যুক্তিসিদ্ধ আশ্চর্য ব্যাখ্যার জন্যেও অধ্যাপক আইয়ুবকে একটি অতিরিক্ত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি'।

তাঁর 'পান্থজনের সখা' গ্রন্থের আলোচনায় সুকুমারী ভট্টাচার্যের মনে হয়েছিল, 'এ-বইয়ের বিষয়বস্তু পূর্ব-প্রকাশিত আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ-এর বিষয়বস্তুর অনুবর্তী'। এবং 'কবিজীবনে বিভিন্ন মূল্যবোধের বিবর্তন ও পরিণতিই এর মুখ্য উপজীব্য'। এই গ্রন্থে তিনি আইয়ুবের রবীন্দ্রচর্চার তিনটি বিষয় পেয়েছেন—ঈশ্বর-চেতনা (তার সঙ্গে প্রকৃতিচেতনাও), প্রেম এবং মৃত্যু। আইয়ুবের নানা যুক্তি ও তথ্য সমাবেশে শ্রীমতী ভট্টাচার্য এইটুকু সারসত্য পেয়েছেন,

> ....রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ। বিশ্বপ্রকৃতির বঞ্চনায় মহাশূন্য ভরে ওঠে প্রেমের মাধুর্যে ও ঐশ্বর্যে। (দেশ, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭৪)

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায় আইয়ুবের 'পথের শেষ কোথায়' গ্রন্থের যে আলোচনা করেছেন, সেখানে তাঁর যথার্থ মনে হয়েছে, 'রবীন্দ্রচর্চায় আইয়ুবের ভূমিকা বিনম্র জিজ্ঞাসুর ভূমিকা।' বর্তমান গ্রন্থটিকে তিনি 'রবীন্দ্রচর্চার অনুবৃত্তি' বলেছেন। কী তাঁর লক্ষ্য ও আলোচনা? শ্রীরায় বলেন,

> নান্দনিক মূল্য নয়, সরাসরি জীবনমূল্য। এই মূল্যজিজ্ঞাসাই আইয়ুবের রবীন্দ্রচর্চার বিশিষ্টতার অন্যতম প্রধান ভূমি।

আইয়ুব দেখিয়েছেন শেষপর্বে রবীন্দ্রনাথ শূন্যতায় ঠেকেননি। বা সংশয়ে অমঙ্গলবোধে আচ্ছন্ন হননি। তাঁর লক্ষ্য 'রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবন, রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির জগৎ'। (দেশ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮)।

আইয়ুব কীভাবে রবীন্দ্রকাব্য পড়েন, ভাবেন তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন ভাষাতাত্ত্বিক পবিত্র সরকার। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকায় (২০০৬-২০০৭) তিনি লিখেছেন 'আবু সয়ীদ আইয়ুবের রবীন্দ্র-বীক্ষা' নামে প্রবন্ধ। সেখানে আইয়ুব 'কীভাবে ইতিহাসদ্ধ আধুনিকতাকে উত্তীর্ণ হয়ে রবীন্দ্রনাথ শাশ্বত (ভাবে আধুনিক) হয়ে ওঠেন, খণ্ড অতিক্রম করে পূর্ণে পৌঁছান' সেই পথরেখা চিহ্নিত করেছেন। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ প্রসঙ্গে একথা বলে শ্রী সরকার 'পান্থজনের সখা'-র এসেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা,

> ...এ বইয়ে পথ ও পান্থ মেটাফর নিয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবোধের সূত্রটিকে, জীবনে দুঃখের ভূমিকা, সখ্য ও প্রেমের সঙ্গে ওতপ্রোত প্রবল দুঃখের অনিবার্য বিশ্লেষণ.

আইয়ুব বিশ্বাস করেন, 'রবীন্দ্রনাথের জীবন একটি পরম পরিণামমুখী'। তৃতীয় গ্রন্থ 'পথের শেষ কোথায়'-এ শ্রীসরকার দেখেছেন এখানে আছে 'রবীন্দ্রনাথের অনন্ত সন্ধানের কথা'। যে-সন্ধান আইয়ুবেরও। স্বয়ং আইয়ুব অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করে যেভাবে অধ্যয়ন ও লেখার ব্রতী হন, রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ ও বিশ্লেষণ করে সেখানে তিনিও 'তাঁর নিজেরও আর্ত অথচ দৃপ্ত সন্ধানকে জলের অক্ষরের মতো নিহিত করে দেন'। কবিতা ও সত্যের সম্পর্ক তাঁর অন্যতম অন্বেষণ। দার্শনিক স্পিনোজার দর্শন প্রসঙ্গে সান্ত্বায়না বলেন, 'The truth is cruel, but it can be loved'.

রবীন্দ্রনাথও বলেন, 'সত্য যে কঠিন / কঠিনের ভালোবাসিলাম'। রবীন্দ্রকাব্যে, গানে আইয়ুব নির্মল প্রশান্তির পাশে দেখেছেন অশান্তি, দুঃখ, অমঙ্গলবোধ, ক্লান্তি ও সংশয়। এই প্যারাডক্স দেখানোই তাঁর কৃতিত্ব। 'Tagore's quest' গ্রন্থে আইয়ুব স্পষ্টই বলেন, 'For great poetry is born of severe tensions and dies with the resolution of those tension'. গানেও শুনি 'মোর তরে হায় শান্তি কোথায় বিশ্বভুবন মাঝে / অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে'। সত্যিই তাই; 'কোথাও আঘাত ছাড়া অগ্রসর বা সূর্যালোক নেই।'

পবিত্রবাবু আইয়ুবের রবীন্দ্র-পরিক্রমায় তিনটি বিষয়সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। যদিও তার ভিতরে আরও অণু-প্রসঙ্গ থাকতে পারে জানিয়ে দিয়েছেন। আলোচনার সুবিধার্থে তাঁর বিভাজন—

১. আধুনিকতা, দুঃখ, পাপ, অমঙ্গল, ট্র্যাজেডি ও রবীন্দ্রনাথ
২. মানবসম্পর্ক, বিশেষত প্রেম, ঈশ্বর-প্রেম ও রবীন্দ্রনাথ
৩. মানসবিবর্তনের মধ্যে কবি; রবীন্দ্রনাথের আজীবন পথচারণা।

প্রসঙ্গত এসেছে নাস্তিক হয়েও কীভাবে তিনি 'গীতাঞ্জলি' আস্বাদ করলেন? এক্ষেত্রে শ্রীসরকার empathy দিয়ে 'ঈশ্বর প্রেমের শিল্পরস' উপভোগ করার কথা বলেছেন স্বয়ং আইয়ুবের ভাষ্য—

> গীতাঞ্জলি পড়বার সময়ে সবিস্ময়ে আমরা যেন দুই জগতের সীমান্ত রেখা ধরে হাঁটছি। একটু এদিকে সরলে পা পড়ে মর্ত্যলোকের মাটিতে, একটু ওদিকে সরলে বাতাসে পাই অমৃতলোকের গন্ধ।

আসলে, তিনি নারীপ্রেমের সঙ্গে ঈশ্বর প্রেমকে একাসনে বসিয়েছেন বলেই নাস্তিকতা প্রতিবন্ধক হয়নি। 'অর্ধেক সত্যের উপরই প্রেমিকের কল্পনা রং বোলাতে পারে' যেমন, ভক্ত ও তাঁর ঈশ্বরকে সেইভাবে দেখেন। বাস্তব ও কল্পনা, দৃষ্টি ও সৃষ্টির সমাবেশে, সমন্বয়ে যে আস্তিকতা রচিত হয় তা ঐশ্বরিক না হলেও চলে। তাঁর রবীন্দ্রচর্চায় শ্রীসরকার অনুভব করেছেন, আইয়ুব 'একটু বেশি তাত্ত্বিক; শুধু কাব্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, একটি জীবনতত্ত্ব, অস্তিত্বতত্ত্ব প্রতিষ্ঠাও যেন তাঁর কাম্য ছিল।' আবারও পবিত্রবাবু স্মরণ করিয়ে দেন, 'আইয়ুবের রবীন্দ্র-সন্ধিৎসা তাঁর আত্মসন্ধানের নামান্তর।' আমরা যারা রবীন্দ্রানুরাগী, তাদের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। তবু দীর্ঘকাল রবীন্দ্রচর্চা করেও আইয়ুবের খেদোক্তি—

> রবীন্দ্রনাথ আমার মনকে প্রসারিত করেছেন, হৃদয়কে সূক্ষ্ম রসগ্রাহী ও সংবেদনময় করেছেন, কিন্তু চরিত্রশুদ্ধি ঘটাতে পারেননি।

নিজেকে তথাপি রবীন্দ্রপ্রেমী বলতে কোনদিন দ্বিধা বোধ করেননি।

অনুকথন ঃ

আইয়ুবের রবীন্দ্রপ্রেম কত গভীর (রাধার সর্বত্র কৃষ্ণদর্শন যেমন) তা বোঝা যায় চিঠিপত্রে; গালিবের শের অনুবাদ সূত্রেও। হোসেনুর রহমানকে এক পত্রে তিনি বলেন, 'রবীন্দ্রসাহিত্য এক নিত্য নব এবং অফুরন্ত বিস্ময়' (১৯৭৯)। আর 'গালিবের গজল থেকে' বইয়ের এক পত্রনিবন্ধের শেষে বলেন,

> ....সোজা পথে হোক, ঘুরপথে হোক, রবীন্দ্রনাথে পৌঁছে যাই ঠিক। তারপরে? মুজতবা আলীর মুখে শোনা একটি গল্প বলি। ছোটো ছেলেকে নামতা মুখস্থ করানো হচ্ছে। ...সে উচ্চৈঃস্বরে বলে চললো—একং দশং শতং ...হরিদ্বার, পুরী, কচুরী, সিঙ্গাড়া, পানতোয়া (এই লাইন থেকে আর সরতে চায় না ছেলেটা), ...আমারও হয়েছে সেই দশা, রবীন্দ্রনাথে পৌঁছলে অন্যত্র চ'লে যেতে সরে না মন, 'তোমার দুয়ার পারায়ে আমি যাই যে হারায়ে'।

Scanned with CamScanner

আধুনিক কাব্যের সমস্যা ঃ আইয়ুবের চোখে

প্রাগ্‌ভাষ ঃ

আধুনিক বাংলা কবিতায় আবু সয়ীদ আইয়ুব যে বিশ্বাসের সংকট দেখেছেন, তার পিছনে তাঁর দার্শনিক মন ও প্রজ্ঞা সক্রিয় ছিল। আধুনিক শব্দটি বিতর্কিত। ভাববাদী কবি মানে অনাধুনিক, যুক্তিবাদী ও জড়বাদী কবি হলেই আধুনিক—এমন ধারণা একালে প্রচলিত। গন্ডগোল সেখানেই। দার্শনিকরা চান Truth. কবিরা চান vision. ট্রুথ মানে যা বিমূর্ত ও যুক্তি, তথ্যময়। আর ভিশান মানে তা সাকার, সুরছন্দময়। কাব্যের জগৎ এজন্য স্পিরিচুয়াল; দর্শনের জগৎ ইন্‌টেলেকচুয়াল। কাব্যকে বেশি যুক্তিবাদী, মেধাবী, বাস্তব করে তুললে সাহিত্যনীতি ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য।

বিস্ময়বোধকে থিওডোর ডান্‌টন রোমান্টিক পুনরুজ্জীবন বলেছিলেন। গ্রীকরা মনে করেন, দর্শনের সূচনা-ও বিস্ময়ে। কবিতার ক্ষেত্রেও এই বিস্ময় বড়ো ব্যাপার। অথচ আধুনিক কবিতায় ও কবিমানসে সেই বিস্ময়বোধ বিলুপ্ত। আইয়ুব একে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর ভাবনার সঙ্গে এলিয়টের dissociation of sensibilityর ধারণার মিল আছে। চিন্তা ও অনুভূতির রসায়ন কাব্যে প্রয়োজন, তিনি মনে করেন। যদিও সপ্তদশ শতকের পর থেকেই ইংরেজি কাব্যে তার অভাব এলিয়ট লক্ষ্য করেছেন। বিস্ময়বোধের অসাড়তা বা disenchantment of the world (বিশ্বনির্বেদ) একালের কবিতাকে বিষণ্ণ, হতাশা, নৈ:সঙ্গ্যপীড়িত করেছে।

(হাইডেগার থেকে সার্ত্র) অস্তিত্ববাদী দর্শন মনে করে, ব্যক্তি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। এক নির্মম, নির্বিকার, রুটিনবদ্ধ বিশ্বের মধ্যে ব্যক্তিমানুষ একা ও বিপন্ন হয়ে বাঁচে। উদ্বেগ তার নিত্য সঙ্গী। ভয়, আশঙ্কা, হতাশা ও বিষাদ নিয়ে ব্যক্তি দেখে, বৃহৎ নাস্তি-র মধ্যে তার ক্ষুদ্র অস্তি বিনাশশীল। এই নিরাশ্রয় ও শূন্যতাবোধ অস্তিত্বের সংকট ঘনীভূত করে। কোনকিছুতেই আর ভরসা বা আস্থা রাখা যায় না। ঔদাসীন্য আর আত্মধিক্কার চেতনাকে নাস্তিক অবিশ্বাসী করে তোলে। যাকে অডেন বলেন, vast spiritual disorder. যার ফলে আধুনিক মানুষের মন এখন ডিসইনহেরিটেড মাইন্ড (disinheritade mind) হয়েছে। আর এই যুগকে বলা যায় 'এজ অফ্ ডিসকন্টিনিউটি।' অর্থাৎ অসন্তোষ, অতৃপ্তিবোধে ভিন্ন জগতের বাসিন্দা হয়ে কবিরাও কোনো ধ্রুব সত্যে ও আদর্শে অবিচল থাকতে পারছেন না। কোনো মঙ্গলবোধে ও মঙ্গলময়ে আজকের মানুষ আর আস্থাশীল নয়। আইয়ুব নিজে ইউম্যানিস্ট দর্শনে বিশ্বাসী। রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠে জেনেছেন, জীবমানব তার অহং আবরণ মোচন করে আপনাকে উপলব্ধি করতে চাইছে বিশ্বমানবে। যা অতিলৌকিক নয়।

"আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে 'কবিতার ভাষা' প্রবন্ধে। তিনি বিশ্বাস-অবিশ্বাস প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন, একালের কবিতায় আছে জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং কবিতার ভাব-ভাষাকে দুর্ভেদ্য, অবেদ্য করে তোলা।

"আধুনিক কাব্যের সমস্যা : বিশ্বাস" প্রবন্ধে এরি বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাই। বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ ও বিবর্তন তিনি দেখান। যেমন—ষোড়শ শতকের এনলাইটেনমেন্ট পর্বের ইউরোপে বিশ্বপ্রকৃতিকে নিয়ম নিগড়ে ধাঁধা ভাবা হতো। ফলে সতেরো শতকের শেষ থেকে ইউরোপে নব্য ধ্রুপদী কবিতা লেখা হয়েছে। যেখানে শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য যথেষ্ট (ভাবে-ভাষায় আঙ্গিকে)। যার সঙ্গে উনিশ শতকের ন্যাচারালিজমেরও কিছু মিল আছে। যারা জড়জগৎ সম্পর্কে নিয়মবাদী কল্পনায় অভ্যস্ত।

Scanned with CamScanner

আঠারো শতকের শেষে রোমান্টিক আন্দোলন কবিতায় নিয়ে এলো বিস্ময়বোধ, সৌন্দর্যবোধ, মানবিক দরদ। কবিতার ভাষাও হলো সুবোধ্য। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপে মার্ক্স ও ডারুইনের জড়বাদী চিন্তা কবিদের মনকে মানববিমুখ করে। এই রন্ধ্রপথে এলেন বোদল্যার। যিনি ডুব দিলেন অন্ধকারে, অসুন্দরে। যা স্পষ্ট, অর্থবোধ, সুঠাম, তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। শুরু হলো যথার্থ আধুনিকতা। কবিতায় এলো ক্ষয়—অবক্ষয়—অশুভ—অসুন্দর বোধ। মনন ও অভিজ্ঞতার প্রক্রিয়ায় আধুনিক কবিতা চায় হাইডেগার কথিত a happening truth-কে। শব্দ ও সত্যের দ্বান্দ্বিকতা যে সান্দ্রতা তৈরি করে, সেখানে সত্যিই 'অগ্রজের অটল বিশ্বাস' খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্যতর বিশ্বাসের প্রস্থানভূমি রচিত হবে।

।।১।।

> ....সংসারের সোনার লঙ্কায় রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্বাসিত হয়ে আছি; রাক্ষস আমাদের কেবলি বলছে, আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজনা করো। কিন্তু সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ঐ ফুল। সে চুপিচুপি আমাদের কানে এসে বলে, আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন, আমিই সেই সুন্দরের দূত। (রবীন্দ্রনাথ)

এই অসামান্য ভাবনা ও বক্তব্যটিকে আমরা একটু বদলে নিলেই কাব্যের ভূমিকা কি, বুঝে নিতে পারি। 'ফুল' শব্দটি সরিয়ে 'কবিতা' শব্দ লিখলেই মনের মধ্যে বার্তা এসে পৌঁছায় সে 'সুন্দরের দূত'; আনন্দের বার্তাবহ। অন্তত দীর্ঘকাল কবিতার ভূমিকা ছিল এইরকম। কখনো যে 'স্মৃতির আকার', 'আবেগের সংরাগ', কখনো বা যা কিছু কুৎসিত, তাকে সুন্দরের অভিমুখী করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ধারণার বশবর্তী ছিলেন, তিনি 'রসতীর্থ পথের পথিক।' উত্তর রবীন্দ্রযুগের কবিরা নতুন পথ ও মত খুঁজতে যখন বিদেশি কবির ভাব-ভাবনা ও প্রকরণের দিকে হাত বাড়ালেন, তখনই এলো উল্টোরথের পালা। কবিতা বোঝা ও বাজা—দুই-ই বর্জিত হলো। এলো বুদ্ধির কসরৎ, শব্দের মারপ্যাঁচ। কীভাবে কবিতাকে স্বতন্ত্র দ্বীপ করা যায়, দূরতর করা যায়, তার প্রচেষ্টা শুরু হলো। এর মূলে অনেকেই দেখলেন কবিদের কাব্যদর্শ বা কাব্যদর্শনের অভাব। আরও সহজ করে বিশ্বাসের ভূমি থেকে কবিরা উৎখাত হলেন বলা যায়। ফলে, আধুনিক, অতি আধুনিক কবিদের কবিতা 'শান্ত অর্থহীন, যেন শুক্‌নো ঘাসে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস,' মনে হয়েছিল আবু সয়ীদ আইয়ুবের। পাশাপাশি তিনি এও মনে করেছেন, 'Modern Poetry is not only intellectual, it is cogitative' (Tendencies in modern Bengali Poetry)।

অপার কাব্যসংসারে কবিকে প্রজাপতি বলা হয়েছে। কবি ও মণীষী বা দার্শনিক। সত্য-ই, কবিতায় দার্শনিক প্রজ্ঞা থাকে। কিন্তু দর্শন মানেই কবিতা নয়। দর্শন চায় সম্যক্ জ্ঞান; কবিতা ও শিল্প চায় ব্যঞ্জনা ও ইশারা। রূপরসগন্ধময় জগতে দার্শনিক উপলব্ধি করতে চান তার তত্ত্বরূপ; কবি-শিল্পী চান তার রসাস্বাদ। ধ্যান ও তন্ময়তা উভয় ক্ষেত্রে আবশ্যক। তবে কবি যে-সুন্দরের ধ্যান করেন সেখানে লৌকিক প্রতিবেশ তুচ্ছ হয়ে যায়। বস্তুর রূপ নয়, রূপের মাধুরী পানেই কবির আগ্রহ। যারা সত্যকার কাব্যরসিক, তাঁরা এই বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী দাপটেও সুন্দরের মুখই ধ্যান করেন।

তবু কবিতা নিয়ে ক্রমাগত অভিযোগ কম নয়। বাজারে সব রকম বই বিক্রি হয়, শুধু কবিতার বই অবিক্রিত থাকে। দু'চারজন খ্যাতিনামা ও মিডিয়াধন্য কবির কাব্য-ছাড়া আর কারো বই বিক্রি হয় না। বিলিয়ে দিতে হয়। পোকায় কাটে। সক্ষোভে আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেন,

> সমাজ ছেড়ে, শ্রেণী ছেড়ে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বৈরাচারে আধুনিক কবিতার আত্মহত্যা আজ আসন্ন। (কাব্যের বিপ্লব এবং বিপ্লবের কাব্য)

এর কারণ হিসেবে দুটি দিক তিনি উল্লেখও করেছেন। তাঁর মতে—

১. কবিতার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এসে দাঁড়িয়েছে সিনেমা, রেডিও, খবরের কাগজ আর সস্তাদরের উপন্যাস। যেখানে আছে স্থূল উত্তেজনা ও লঘু চিত্তবিনোদন।

২. অভিমানবশত কবিরা তাঁদের কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য দেখাতে বেছে নিলেন দুরূহতা। কাব্যকৌশল—কডওয়েলের ভাষায় 'skill-fetishim', মালার্মের উপদেশ তাঁদের উৎসাহিত করলো, 'Poetry is written with words, not with ideas.'

এছাড়াও সমস্যা, কবির শব্দচয়নে ও বিন্যাসে যে আনুষাঙ্গিক চিত্রকল্প ভাবাবেগ জাগাতে চায়, সেখানে অনেকক্ষেত্রে সেই 'ভাবানুষঙ্গ নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার'। যা এলিয়টের ভাষায় পাঠকের কাছে বোঝার সংকট তৈরি করে। প্রচলিত অর্থ (meaning) ছেড়ে কিছু কবি 'assuming that there are other minds like their own'. ফলে সেতুবন্ধন ঘটে না। আর কমিউনিস্ট ভাবধারার কবিরা আবার একদেশদর্শী। তাঁদের মতে, পথে যাঁরা নেই, তাঁরা সেই কবিতার স্বাদ নিতে অক্ষম। তাঁদের কবিতা বা 'Art, an instrument in the class struggle'. কবিরা ভাবেন সেই সাহিত্যই যথাযথ, যা 'written from a Maxist or near-Marxist point of view? এতখানি অন্ধত্ব কাম্য হতে পারে না সাহিত্যে। টি.ই.ইউম তো বলেছেন, 'প্রত্যেক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবিধ ধারার মূল উৎস হচ্ছে কতকগুলি প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস। ....সেকানে যুক্তিতর্কের অবকাশ নেই, প্রমাণ-অপ্রমাণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।' (কাব্যের বিপ্লব এবং বিপ্লবের কাব্য)। যে-হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদ আমাদের সজীব রাখে, কালে-কালোত্তরে তার বিকার ও ক্ষয় ঘটেছে। তারই ফলে কবি ও কবিতায় যুগপ্রভাবে বিশ্বাসের এত সংকট।

শ্রী অরবিন্দ তাঁর 'The Ideal form and Sprit of poetry' প্রবন্ধে কবিতাকে 'মন্ত্র' রূপে দেখেছেন। কবিতায় সত্য ও পরমকে খুঁজছেন বহু কবি। যেমন কবি কীট্‌স্ ও রবীন্দ্রনাথ। সেই উত্তরাধিকারই শ্রী অরবিন্দে বিবর্তিত হয়েছে। কবিতায় সুষমা ও সংগতি নিয়ে আসে Truth, Beauty, Delight, Life and Spriit। যাকে ছাড়া আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণ হয় না। আবু সয়ীদ আইয়ুব নাস্তিক হলেও কবিতার এই দার্শনিক প্রজ্ঞাকে মান্য করেছেন। তবে এটাও সত্য, চাপিয়ে দেওয়া রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতাদর্শ কবিতার পক্ষে শুভ ও সুখদায়ক হতে পারে না। এতে সৃজনশীলতা ক্ষুণ্ণ হয়। বাউলগানে এই ভাবনাটির চমৎকার ব্যাখ্যা পাই—

> ও নিঠুর গরজী,
> তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে?
> তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে?

ভালো কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে হয়। যন্ত্রণাও পেতে হয়—ধ্রুব সত্য।

।।২।।

আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর 'বিশুদ্ধ ও ফলিত সাহিত্য' প্রবন্ধে স্পষ্টই বলেছেন, "যে-সাহিত্য কেবলমাত্র সমাজবিপ্লবের ধারালো অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যেই তৈরি তাকেই আমি 'ফলিত সাহিত্য' নামে অভিহিত করেছি"। অর্থাৎ উদ্দেশ্যমূলক বা জনহিতকর ভাবনা-সঞ্জাত সাহিত্য এগুলি। আর যেখানে আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগই বড়ো ব্যাপার, সেটাই 'বিশুদ্ধ সাহিত্য'। কবি ও লেখকের হৃৎকমলের রাঙা রেণুতে পাঠক রঙিন হন; আর কোনো উদ্দেশ্যই সেখানে থাকে না। কবিতা কি? এ নিয়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সুখ্যাত উক্তি 'poetry is emotion recollected in tranquillity' প্রায় অনুরূপ ভাবনায় এলিয়টকে বলতে শুনি, 'Poetry is excellent words

Scanned with CamScanner

in excellent arrangement and excellent metre'. তবে সাহিত্য বা কবিতা যে রসের ব্যাপার, ভারতীয় আলঙ্কারিকদের এই অভিমত খুব মূল্যবান। পাঠককে তাই হতে হয় সহৃদয়। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন, 'সকলরকম হৃদয়বোধেই আমরা বিশেষভাবে আপনাকেই জানি, সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ' (সাহিত্যের পথে)। কবিতা আনন্দরূপের অমৃতমূর্তি।

শ্বেতকেতু তাঁর পিতা আরুণিকে বলেছিলেন, 'যে বস্তু বর্তমান, তাঁকে জানলে, প্রত্যক্ষ করলেই তো সব জ্ঞাত হওয়া যায়।' প্রত্যুত্তরে আরুণি বলেন, ঠিকই। তবে 'এই মূল উপাদানের পিছনে যে রহস্য আছে তাঁকে জেনেছ কি?' রাসেল-দর্শনে বিশ্বাসী আইয়ুবও এভাবেই ভাবেন। তার সঙ্গে তাঁর পদার্থবিদ্ মন বিজ্ঞানের ভূমিকা খুঁজতেও চায়। সেক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের মতো বলেন না, 'বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু'। তবে লক্ষ্য করেন, বিজ্ঞান যতই নিয়মের রাজ্য উদ্‌ঘাটন করে, ততই 'নীতির রাজ্যের খন্ডিত প্রকাশ দেখে ক্লিষ্ট হচ্ছি, হতাশায় ভেঙে পড়ছি'। একটি লেখায় তিনি 'নিয়মগত নয়, নীতিগত শৃঙ্খলা' চেয়েছিলেন মানবিকতার স্বার্থে। মানুষের মন ও স্বাধীন ইচ্ছা কোনদিনই 'গ্রহনক্ষত্রের মতো পদার্থ-বৈজ্ঞানিক নিয়মের দ্বারা সম্পূর্ণ আবদ্ধ থাকবে' বলে ভাবেননি; কারণ, 'তাতে তো মানবিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে।' তাই কবির কর্মে তিনি চান হৃদয়োপলব্ধি ও শ্রেয়োনীতির যোগ।

১৯৭৭-এ প্রকাশিত হয় 'পথের শেষ কোথায়' গ্রন্থটি। গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলি লেখা হয় ১৯৩৪ থেকে ১৯৭৬ এর সময়সীমায়। তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অবশ্য ঘটেছিল ১৯৬৮তে প্রকাশিত 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটির জন্য। চোদ্দটি প্রবন্ধ নিয়ে (২টি ইংরেজি প্রবন্ধ) রচিত 'পথের শেষ কোথায়।' রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর লেখা নিয়ে তিনটি প্রবন্ধ আলাদাভাবে মনোযোগ দাবি করে। তবে কবি ও কবিতা নিয়ে তাঁর সুদীর্ঘ দিনের ভাবনা এই গ্রন্থে তিনটি প্রবন্ধে সরাসরি প্রকাশ পেয়েছে। যাঁর মাতৃভাষা উর্দু, তিনি কীভাবে বাংলা ভাষা শিখলেন ও বাংলা ভাষায় স্মরণীয় লেখক হলেন তার আভাস পাই আত্মকথাধর্মী লেখা 'ভাষা শেখার তিন পর্ব এবং প্রসঙ্গত' সূচনা-রচনায়। আধুনিক কবিতা নিয়ে তাঁর তিনটি বাংলা ও একটি ইংরেজি প্রবন্ধের মধ্যে 'আধুনিক কাব্যের সমস্যা ঃ বিশ্বাস' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর পাশে পড়া যায় Tendencies in Modern Bengali Poetry প্রবন্ধটি। কিন্তু এটি নির্বাচিত তিরিশ ও চল্লিশের কবিদের কবিতা ও মনোভাব নিয়েই লেখা। রবীন্দ্রোত্তর কবিতায় রোমান্টিকতা মুছে নিয়ে মার্ক্সিস্ট ভাবনার প্রসার কীভাবে ঘটল দেখিয়েছেন। যার নিদর্শন 'কাব্যের বিপ্লব এবং বিপ্লবের কাব্য' প্রবন্ধেও পাওয়া যাবে। এখানে তিনি কবিতার দুর্বোধ্যতা, আর্ট-সমাজ- বিপ্লববাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর্ট ফলিত ও বিশুদ্ধ, তা নিয়েও যুক্তিতর্ক সাজিয়েছেন।

।।৩।।

আধুনিক কবিতা নিয়ে তাঁর মতো দার্শনিক মনস্বী ব্যক্তির আলোচনার অধিকার কতখানি? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি, একদা বুদ্ধদেব বসু, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলে তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলন করেছিলেন। পরে বুদ্ধদেব বসু সরে যান। এই গ্রন্থে তিনি যে 'ভূমিকা' লেখেন ('পথের শেষ কোথায়' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত), তা পড়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ খুশি হন। বলেন, 'মনে হয় যেন তুমি আধুনিক কবিদের মনের কথাটি ধরতে পেরেছে, আমাকে বুঝিয়ে বলো দেখি কথাটি কি?' এই বক্তব্য স্বয়ং আইয়ুবের। একটি সাক্ষাৎকারে (ভারত বিচিত্রা / ৩১ আগস্ট, ১৯৭৭) তা পাওয়া যায়। আপাতত 'আইয়ুব ঃ স্মরণগ্রন্থ' (মুহম্মদ সইফুল ইসলাম সম্পাদিত) দেখলে পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকারের বিবরণ পাওয়া যাবে।

'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থেও আইয়ুব কাব্যে প্রদর্শিত আধুনিকতা সম্পর্কে কিছুটা বিরূপ

প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। দেখেছিলেন, কবিরা কাব্যশরীরে যত্নবান্, কাব্য-আত্মার প্রতি মনোযোগী নন। ভাষাকে স্বচ্ছ না করে ধ্বনিময় ও দুর্বোধ্য করার দিকে কবিদের ঝোঁক। আর বোদল্যার-প্রাণিত হয়ে কবিরা অমঙ্গল বিষয়ে অতি সচেতন—'overwhelming consciousness of evil'. অর্থাৎ আধুনিককালের কবিতায় তিনি দেখেছেন নৈরাশ্য আর দুর্বোধ্যতা। ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছে; সৎ সাহিত্যও আছে। তবু অধিকাংশ কবি ও কবিতার মধ্যে পেয়েছেন—বোরডম্, বিরক্তি, বিতৃষ্ণ, বিবমিষা এবং আনন্দ, বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও কৌতূহলের অভাব। তবু তাঁর স্বীকারোক্তি, 'আমার নালিশ সমগ্র আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে নয়।' উল্লিখিত দুটি ধারা নিয়েই তাঁর আপত্তি। আধুনিক কবিরা 'রোমান্টিকতার মোহ' থেকে মুক্তি চান, এটা তাঁর পছন্দ নয়। এটাকে তিনি 'কবিচিত্তে বিস্ময়বোধের অসাড়তা' বলেছেন। তাঁর ভাষ্য—'গ্রীকরা বলতেন বিস্ময়ে দর্শনের সূত্রপাত ঃ কবিতারও শুরু সেইখানে' (অমঙ্গবোধ ও আধুনিক কবিতা)। যদিও আমরা জানি, হাইডেগার থেকে সার্ত্র পর্যন্ত দার্শনিকরা অস্তিত্ববাদের আলোচনায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'। তাই উদ্বেগ, টেনশন্, বিষাদ আর নেতিবাচকতা ('অনুমানে শুরু সমাধা অনিশ্চয়ে' / সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) আজকের মানুষের অনিবার্য নিয়তি। একজন কবি শুধু যুক্তিবাদী বা শুধু ভাববাদী হতে পারেন না। পাখির দুটি ডানার মতো দুইই থাকা দরকার। কবিতা তত্ত্ব বা দর্শন নয়; আবার দর্শনহীন কবিতায় স্মরবস্তু থাকে না। সত্য ও সুন্দরের উপাসক দুইই। এই প্রসঙ্গে আইয়ুব সাক্ষী মানবেন কবি কোলরিজের এই উক্তি—'No man was ever yet a great poet without being at the same time a profound philosopher', তবে একথাও জানেন, যেমন আর্চিবল্ড ম্যাকলিশ বলেন, 'Poetry should not mean, but be'. কবিতার ভাষা যেমন নৈঃশব্দ্যের ভাষা, তেমনি ব্যঞ্জনাধর্মও থাকে। তবে কবিতার ভাষা দুর্বোধ্য হলে পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অক্ষম, এও বলেন। ভাষা ও ভঙ্গির মারপ্যাঁচে কবিতার মৃত্যু ঘটে। মারিত্যাঁর ভাবনা অনুসরণে তিনিও বলেন, 'বাস্তবজগতের অংশবিশেষ যদিও ভাষার স্বাভাবিক অভিধা, তবু তা আড়াল করে রাখে সেই পরমসত্তাকে যার আভাটুকু প্রতিবিম্বিত করা কবিতার চরম লক্ষ্য' (অমঙ্গলবোধ ও আধুনিক কবিতা)। কবিতায় ভাবগত ও ভাষাগত অস্বচ্ছতা আইয়ুব চান। পরিষ্কার ভাবে বলেন, পাঠককে বুঝিয়ে দেওয়া বা তাঁর অনুভবের সঙ্গী করা কবিরই দায়িত্ব। ১৯৩০ এর পরে অধিকাংশ কবির কবিতার তিনি দেখেছেন 'জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা' আর 'কবিতাকে বহির্জগতের কবিহৃদয়ানুরঞ্জিত উপলব্ধির বাহন জ্ঞান না ক'রে দুর্ভেদ্য শব্দের আর্টিফ্যাক্ট ঠাওর করা'। যা তাঁর মতে 'দুর্লক্ষণ'.

দীর্ঘকাল লালিত এই ভাবনারই সংহত প্রকাশ দেখি তাঁর 'আধুনিক কাব্যের সমস্যা ঃ বিশ্বাস' নামাঙ্কিত দীর্ঘায়ত প্রবন্ধে। শুরুতেই তিনি স্বীকার করেছেন, 'সমস্যাটি বিশদ ক'রে বলবার দরকার নেই।' কেননা, এর আগে অন্যান্য প্রবন্ধে তো তা বলেছেন। ফলে সরাসরি বিষয় ও বক্তব্য বুঝিয়ে দিতে তৎপর হয়েছেন। বলেছেন,

...সাম্প্রতিক কবিতায় এসেছে গন্ডিবদ্ধতা, কোনো কোনো স্থলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কারাবাস।

আরেকটু ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 'কবি এবং তাঁর পাঠকের মাঝখানে অবোধ্যতা ও অবেদনীয়তার প্রাচীর উঠেছে।' অর্থাৎ শব্দগত পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁর মূল বক্তব্য একই। আধুনিক কাব্যে দুর্বোধ্যতা ও হৃদয়ানুভবের অভাব তাঁকে পীড়িত করে। তিনি কাব্যের পূর্বাপর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখেছেন, কবিতা ও শিল্পকলার 'জন্ম হয়েছিলো ট্রাইবের সম্মিলিত অনুভূতির মধ্যে।' সাহিত্য তখন গোষ্ঠীগত ছিল, ব্যক্তিগত নয়। যেদিন সমাজ শ্রেণীস্বার্থে বিভক্ত, খন্ডিত হলো সেইদিন থেকে কবিতা শ্রেণীবিশেষে আবদ্ধ হলো। তৈরি হলো বৃহত্তর গোষ্ঠীর বদলে ছোটছোট গোষ্ঠী। নিজেরাই যারা কবিতা লেখে, পড়ে, শোনে ও পিঠ চাপড় দেয়। একদা টলস্টয়

Scanned with CamScanner

সাহিত্যকে 'বৃহত্তম সংখ্যার জন্য গভীরতম অভিজ্ঞতার প্রকাশ' বলেছিলেন। যা আজ উপহসিত। একালের মূল্যায়ন এই, সেই শ্রেষ্ঠ শিল্পী, 'যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার কাছে সূক্ষ্মতম কলাকৌশলের বাজি দেখিয়ে থাকে'। 'অতিসূক্ষ্ম টেকনিক' আর 'কলাবিদের কালোয়াতি' এই হলো তাঁদের বাহাদুরি। যাকে বলা যায়, ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলানো। মূল বক্তব্য তাই অধরা থেকে যায় পাঠকের কাছে। কাজেই 'আঙ্গিক এবং প্রসঙ্গের ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য থেকে অলঙ্ঘ' হয়ে ওঠে। একশ'জন পাঠকের মধ্যে সাড়ে নিরানব্বই জনের জন্য কবিদের আগ্রহ, ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। এক্ষেত্রে আইয়ুব নিজেকে 'হতবুদ্ধি পাঠকমাত্র' বলেছেন। কীভাবে কবিতা এখন নাগালের বাইরে যাচ্ছে, কিংবা মনে আর বাজেনা, বোঝাও যায় না তার একটু দৃষ্টান্ত দিই। যা থেকে বোঝা যাবে, শুধু পাঠক নন, কবিও 'হতবুদ্ধি' কিংবা 'আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ / আপনারি আবরণ।'

১. বাঘ রোজ তাড়া করে আমিও লুকোই
তোমার শরীরে খুঁজি রঙচঙে মই। (সব্যসাচী সরকার)

২. এবার ফোলানো কন্ডোম ঝুলিয়ে সাজাব ঘর।
এবার হিসি চেপে ফোলাব কিডনি। (স্বরূপ চন্দ)

৩. মগজের মাই টানছে কার্তুজবাজ আঙুল।
চারদিক থেকে
ছুটে ওঠে স্ত্রীমেলের ডাক। (প্রণব পাল)

জানি না, কবিতাপ্রিয় পাঠকেরা এগুলি হজম করতে পারবেন কিনা। এর পাশে আছে নবতর শব্দপ্রয়োগের চমক, চটক, গিমিক। যেমন—শাড়িয়ালি, বন্ধুয়ারি, লাভাভা, রোদেলা, রোদেরু, রোদস্মিক, রোদকাজ, রোদগ্রাফ, ছুটশীল, তুমিলিয়া, আঁচলিনী, রাস্তাবতী, আদরবাসা, দৃষ্টিয়ান, চেয়ারিনী, পৃথিবীয়ানা, নকলানো, মেয়েমি ইত্যাদি। বানিয়ে তোলা বা জোড়কলম শব্দগুলি কতটা অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য তা পাঠকের বিচার্য। কিছু নমুনা—

১. কুয়াশানাই — সুরমাখা কুয়াশা
২. এনার্জেন্সি — দ্রুত এনার্জি
৩. রোদাস্কর্য — রোদের ভাস্কর্য
৪. হাওয়াস্কার্য — হাওয়ার কারুকার্য
৫. সেক্সোবতী চাঁদ — চাঁদ কামনাময়ী
৬. সেনসেক্সোবান — ষাঁড় ও শেয়ার বাজার
৭. শূন্যজিয়াম — শূন্য মিউজিয়াম
৮. ফিকেলতা — ফিকে / ফ্যাকাশে বিকেল
৯. রোদাস্মিক — আকস্মিক রোদ
১০.স্মৃতিলজিয়া — স্মৃতি + নস্টালজিয়া ইত্যাদি

কবিতা শব্দার্থ শরীরময় নিশ্চয়। একই শব্দ সুদীর্ঘকালের প্রয়োগে তার উজ্জ্বলতা ও ধার হারায়। কিন্তু বিকৃত, উদ্ভট, অব্যাকরণিক শব্দ প্রয়োগ কী নতুনত্ব আসে জানি না। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঠাট্টা করে এজন্য বলেছিলেন, 'একটা নতুন কিছু করো'। নতুনত্বের নেশায় উদ্ভট, অদ্ভুত, অবোধ্য ও অবেদনীয়র আগমনে আইয়ুব বিব্রত ও বিরক্ত।

একুশ শতকে একজন কবি ভাষাবদলের স্বপক্ষে অবশ্য জোরালো সওয়াল করেছেন। তাঁর মতে, 'একই শব্দ দশকের পর দশক চিবোতে চিবোতে শব্দ আর ম্যাটার করছে না।' তাই একঘেয়েমি

দূর করতে নতুন শব্দ নির্মাণ জরুরী। 'এই ছুটচিক্যের কেল্লায় যে Poetic licence তাকে স্বাধীনতা দিতেই হবে'। শব্দ ও ভাষা নির্মাণে risk নিতে হবে। বৈয়াকরণ ও কবি এক ধাতুতে গড়া নয়। তবু পড়ি—

ভাষা বদল মুক্ত পাখি সীমাহীন। তার ডানায়
বাঁধনহারা শূন্যীলের ডাক।...

কবিতার নতুন চোখে লেখে আছে 'কাঁচালো রোদবার, নবীন মুদ্রামি, ছুটবতী মুখের ডানামোয় দূররিয়ালিজম্'। (দ্র. ভাষাবদলের গদ্য / প্রণব পাল / নতুন কবিতা প্রকাশনী, কলকাতা-৪০ / ফেব্রুয়ারি, ২০১৩)। আমরা এখন শুধু অপেক্ষা করতে পারি নতুন ভাষার যাত্রা সার্থক হবে কি হবে না; দেখার বিষয় এটাই। আইয়ুবের ভাষায় কবিরা এখন 'পরীক্ষাগারের বৈজ্ঞানিক।'

।। ৪ ।।

আবু সয়ীদ এরপর সোজাসুজি বিশ্বাস প্রসঙ্গে প্রবেশ করে বলেছেন, 'আজকের কবিরা "অগ্রজের অটল বিশ্বাস" হারিয়েছেন। সংশয় ও প্রশ্নে, সন্দেহে আর দ্বিধায় তাঁরা দীর্ণ। পূর্ববর্তী কবিরা (মধ্য যুগ থেকে উনিশ শতক এবং রবীন্দ্রনাথ) যে-কোনো বিশ্বাসে স্থিত ছিলেন। 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ' এই ছিল তাঁদের ধারণা। যে-রবীন্দ্রনাথ নানা ঘাত প্রতিঘাতে দ্বন্দ্বদীর্ণ, পথের শেষ কোথায়? জানতে চান। তিনিও মৃত্যুর আগে ছলনাময়ীর জাল ছিঁড়ে সত্য ও শান্তিকে দেখতে চেয়েছেন। রূপনারাণের কূলে জেগে ওঠা কবি আত্মা বলে,

সত্য যে কঠিন
কঠিনের ভালোবাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা।

আঘাতে, বেদনায় মুহ্যমান হয়েও এই তাঁর বিশ্বাস। সেখানে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মনে করেন ঈশ্বর এক কল্পিত রূপ। যিনি কোনদিনই ত্রাণকর্তা নন।

উড়ায়ে মরুর বায়ে ছিন্ন বেদ-বেদান্তের পাতা,
বলেছি পিশাচ হস্তে নিহত বিধাতা।

আধুনিক কবিদের নেই 'উঞ্ছপুষ্ট জ্যেষ্ঠদের তৈলসিক্ত মেদ'। বদলে 'কবিতার শুক্‌নো হাড়ে ঘুণ ধরেছে'। যে-ঘুণের নাম অবিশ্বাস।

ইংরেজি সাহিত্য থেকে আইয়ুব নজির টেনে এনে দেখিয়েছেন, পাশ্চাত্যেও ছিল সংশয়বাদ। লর্ড টেনিসন্ তাঁর 'ইন্ মেমোরিয়াম্' কাব্যে বন্ধু হ্যালামের মৃত্যুতে ঈশ্বরে আস্থা হারান। যদিও কাব্যের শেষে বিশ্ববিধানে আস্থা পোষণ করেছেন। মৃত্যুর নিষ্ঠুরতায় তাঁর মনে হয়েছিল, 'A monster then, a dream, / A discord'. আবার বিলাপের জন্য ক্ষমাও চান—'Forgive my grief for one removed' এবং প্রবল আস্তিক্যে বলেন, 'I trust he lives in thee', মহাবিশ্বে মহাকাশে সে পরমের কাছে, এই তো ভরসা ও বিশ্বাস। ম্যাথু আর্নল্ড একসময় অনুভব করেছিলেন, অশ্রুপারাবারে প্রতিটি মানুষ বড়ো একা। তবে প্রকৃতির ছায়ায় মায়ায় তিনিও বিষাদের গুরুভার থেকে মুক্ত হন। Dobermann কবিতায় কবির মনে যে সজনতা ও নির্জনতার দ্বন্দ্ব থাকে এবং দুই-ই কাম্য বলে আর্নল্ড লেখেন—

One derives him to the world without
And one to solitute.

কবি শেলি ও তাঁর Adonis কাব্যে মৃত্যু পার হওয়া জীবনে আস্থা রাখেন।

Scanned with CamScanner

Peace, Peace, he is not dead, he doth not sleep
he hath awakend from dream of life.

বাংলা কাব্যে অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁর 'এষা' শোককাব্যে স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকাহত ও সংশয়ী হয়েও শেষপর্যন্ত মঙ্গলময়ে বিশ্বাসী (বলেছেন)—

ভাঙ্গতে গড়নি প্রেম, ওহে প্রেমময়।
স্মরণে নহি তো ভিন্ন,
প্রেম-সূত্র নহে ছিন্ন—
স্বর্গে-মর্তো বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কবিরা তাঁদের 'স্মারণিক কাব্যে' শেষ পর্যন্ত জানিয়েছেন, 'সৃষ্টি ছুটে চলেছে এক পরমার্থ দিব্যধামের অভিমুখে, যেখানে আছে প্রেম এবং প্রেমের ঈশ্বর।' এর পাশে আইয়ুব দেখেছেন আধুনিক কবিদের কবিতায় 'রূঢ় নিরেট নাস্তিকতা'। প্রসঙ্গত বলা ভালো, প্রচলিত ঈশ্বর ও ধর্মাচরণে আইয়ুবের আগ্রহ ছিল না। তাঁকে 'ধর্মহীন ধার্মিক' আখ্যা দিয়েছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। আইয়ুবের কাছে 'ধর্ম' মানে রিলিয়ন বা রিচুয়ালস্ নয়। 'সাধু এবং সজ্জন' ও 'সেকুলারিজম্ ও জওয়াহরলাল নেহরু' প্রবন্ধদ্বয়ে এনিয়ে অনেক কথা বলেছেন। যার মূলভাব—'ধর্মভাবের একটি অর্থ অনন্তের প্রতি রহস্য, বিস্ময়, আনন্দ ও শ্রদ্ধার ভাব।' এখানে 'ধর্মভাব' শব্দটি সরিয়ে যদি 'কবিতার ভাব' লিখি তো আইয়ুবের বক্তব্য ও ভাবনা বুঝে নেওয়া সহজ হতে পারে।

আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর বিশ্বাসের সংকটের বহুরূপ দেখেছেন বিজ্ঞানে, দর্শনে, রাজনীতিতেও। কীভাবে যুগ-যুগান্তরে একেকটি বিশ্বাস গড়ে ওঠে আর ভাঙে, তা নির্দেশ করেছেন। সপ্তদশ শতকে যে প্রাকৃতবিজ্ঞানে আধিপত্য তা অষ্টাদশ শতকেও নির্দ্বন্দ্ব ছিল। যার প্রধান বিষয় 'জড়প্রকৃতি জীবজগৎ মানবসমাজ সর্বত্রই অখণ্ড নিয়মের রাজ্য, সমস্তই সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত।' যার প্রভাব শিল্পে, সাহিত্যে দেখা গেছে। এতটা নিয়মানুগ হওয়ার ফলে, সাহিত্যে-শিল্পে এসেছে কেতাদুরস্ত ভঙ্গি, আঙ্গিক হয়েছে ছাঁচে ঢালা, প্রথাসম্মত। 'তাসের দেশ' নাটকে যেমন বলা হয়েছিল, 'চলো নিয়মমতে।' এই নিয়মচারিতাকে হিউম মানলেন না। যুক্তি ও আভিজ্ঞতার নিরিখে তাঁর দাবি, নিয়মানুবর্তিতা বলে কোথাও কিছু নেই। ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যের ধ্রুপদিয়ানা তো এই নিয়ম মানার ফসল। যা রোমান্টিক সাহিত্য ভেঙে চুরে দিয়েছিল।

অন্যদিকে আইনস্টাইন জানালেন—

The most beautiful and most profound emotion we can experience is the sensation of the mystical. It is the sower of all true sceince.

পদার্থবিজ্ঞানে তিন মহাতত্ত্ব—Max Planck—এর Quantum ও Albert Einstein এর Relativity এবং Unified Fields অণু-ব্রহ্মান্ড ও মহাব্রহ্মান্ডের দুই রহস্যসন্ধানী বিজ্ঞানী তাঁরা। কোয়ান্টাম তত্ত্বে আমরা যা দেখি ও অনুভব করি তা হলো emission–ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। যেমন, যে ফুল দেখে চোখ মুগ্ধ, বিজ্ঞান বলে রেটিনায় তার উদ্ভাসন ঘটে। সেখানে ফোটন (photon) বা শক্তিকণা আঘাত করে। মস্তিষ্কে তার বার্তা পৌঁছায়। চেতনা সজাগ হয় এবং তখনই ফুল দেখার কাজ সম্পূর্ণ হয়। Law of casuality-ও বলা যায় একে। যা নিয়ে এডিংটন প্রশ্ন তোলেন। ইলেকট্রন ও প্রোটন কীভাবে চিহ্নিত হবে? প্ল্যাঙ্কের উত্তর, মানুষের মধ্যেই ওগুলো আছে; কাজেই আলাদাভাবে তাকে দেখানো যায় কি? প্লাঙ্কের সমর্থনে নীলস্ বোর (Niets Bohr) বললেন।' 'We are both spectators and actors in the great drama of existence.'

যে নিয়মানুবর্তিতা নিয়ে বাদানুবাদ সেখানে আইনস্টাইন time ও space নিয়ে রিলেটিভিটি

তত্ত্ব তৈরি করলেন। অবিচ্ছেদ্য দেশ ও কালের ধারায় বাঁধা ব্রহ্মাণ্ড। এক মহাসঙ্গীত বেজেই চলেছে, যা অনুভববেদ্য, আর একালে সার্নের বিজ্ঞানীরা 'ঈশ্বর কণা'র জয় ঘোষণা করলেন। পদার্থের কণা ও তরঙ্গ বহুরূপী নয়, সত্য প্রমাণিত হলো। বিপুলা এ পৃথিবীতে দেখা গেল দুই নিয়ম—অতিকায় নক্ষত্র ও মহাশূন্য; অন্যদিকে অতিক্ষুদ্র কণিকা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন। 'একের নিয়ম খাটে না অন্যে' বলেন আইনস্টাইন। আর স্টিফেন হকিং কৌতুকে ও খেদে বলেন, 'পদার্থবিজ্ঞানের শেষ সূত্রটা অবিষ্কার করতে পারলে আমার ভাগ্যে জুটে যাবে নোবেল প্রাইজটা।' নিউটনের মহাকর্ষ, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার পাশে হকিং শোনালেন সময়ের বহমানতার তত্ত্ব। তা শূন্য, নাকি শূন্য নয়? উত্তর অজানা।

(দ্র. ঈশ্বরকণা মানুষ ইত্যাদি / পথিক গুহ / আনন্দ পাবলিশার্স / ২০১৫)

আইয়ুব বললেন, বের্গসঁর কথা। যাঁর Elan Vital তত্ত্ব 'প্রাণ এবং মনের ক্ষেত্রে গাণিতিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যর্থতার ঢাক' পিটে জানিয়ে দিলো প্রাণপ্রৈতির কথা। ডারুইন বলেছিলেন, জীবন 'endless struggle for existence' (Origin of Species 1859)। তাঁর theory of evolution বিশ্বে সাড়া ফেলে দেয়। মানুষ যে ঈশ্বর-পুত্র নয়, বানর থেকে নর সে জেনে বিশ্ব আহত ও বিস্মিত হলো। Svante Arrhenius ঘোষণা করলেন 'প্রাণী শাশ্বত' তাকে বানানো যায় না। লুই পাস্তুর বললেন, 'Life never arises except from life'. বের্গসঁ এই ব্যাপারটিই অন্যভাবে দেখালেন। প্রাণ তাঁর কাছে সৃজনধর্মী—যা চৈতন্যবান-ও (consciousness)। কখনো তা ঈশ্বরতুল্য। এ প্রসঙ্গে শ্যামাপদ চক্রবর্তীর প্রাজ্ঞ অভিমত—

সহজ কথায়, বের্গসঁর Creative Evolution নূতনভাবে লেখা Biology নয়, ঠিক দর্শনও নয় আবার বিজ্ঞানও নয়। তবু তাঁর কাছে আমরা ঋণী।

(দ্র. কাব্যের রূপ ও রস)।

এরপর এলেন ভিয়েনার চিকিৎসক ফ্রয়েড। যিনি মানুষের মনের অতলে ডুব দিলেন। 'মন' মনোবিজ্ঞানীদের কাছে nerve ও reflex এর খেলা। O. L. Zangwill বললেন, 'Mind is viewed as product of organic evolution'. প্রাণ ও মন জড় পদার্থ নয়, আকস্মিক ঘটনার ফল নয়; তা এক অন্ধশক্তির লীলা ('interplay of blind forces') বললেন Dr. Kenneth Walker তাঁর 'Human Physiology' (1951) নামাঙ্কিত গ্রন্থে। জগদীশচন্দ্র বসুর গাছের প্রাণ আবিষ্কারকে স্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, জীবন খন্ডিত নয়, সমগ্র এবং 'not as an accident collection of isolated living individuals'. বৃহদারণ্যক উপনিষদ এজন্যই বলেছে 'প্রাণো বৈ পরমং ব্রহ্ম'।

ফ্রয়েড অবচেতন নিয়ে যা বললেন, তাতে এতদিনের বিশ্বাস ভেঙে গেল। মা-ছেলে, বাবা-মেয়ে, ভাই-বোন, প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে যে সম্পর্ক, যে দিব্যভাব, মাধুর্য—তা রইল না। সবই নির্ধারিত হলো যৌনবাসনার দ্বারা। Sex and love মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ জানা গেল। শুদ্ধতা, দৈবভাব হাস্যকর প্রতিপন্ন হলো। জগদীশ গুপ্তর গল্প 'শঙ্কিত অভয়া', বিমল করের 'আত্মজ' যার দৃষ্টান্ত। প্রেমের স্বপ্নময় রূপ নষ্ট হলো। বুদ্ধদেব বসু লিখলেন 'বন্দীর বন্দনা' কাব্য। যেখানে প্রেমের পাশে 'কামনার কুৎসিত দংশন' এড়িয়ে যাওয়া গেল না। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি-লেখকেরা এই ঝাঁঝালো রসে আবিষ্ট হলেন। রাবীন্দ্রিক জ্যোতির্ময় বিদেহী প্রেম প্রত্যাখাত হলো। প্রেমে এলো প্রতারণা অবিশ্বাস, বঞ্চনার জ্বালা। একুশ শতকে তাই এখন কেউ আর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে 'দেবদাস' হয় না। প্রেমিকাকে ধর্ষণ ও খুন করে। নয়তো তার মুখ অ্যাসিডে পুড়িয়ে দেয়। ভালোবাসায় প্রতিহিংসার জন্ম মানুষকে প্রেমের স্বর্গ থেকে বিচ্যুত করল।

Scanned with CamScanner

।। ৫।।

মার্ক্সীয় ভাবনায় শ্রমের গুরুত্ব অনেক। সমাজে যে খাটবে সে খাবে। পরাশ্রিত বা পরজীবী হওয়ার মধ্যে গৌরব নেই। সমাজ হবে মৌচাকের মতো। বহুর কল্যাণে অনেক মিলে শ্রম-মধু সঞ্চয় করবে তার সুফল সবাই ভোগ করবে। তবে মার্ক্স-ও মনে করেন সাহিত্য ও শিল্পের উপভোগে 'You must an artistically cultured person'. তবে সকলের বোধ ও অনুভব, স্বাদ গ্রহণের শক্তি সমান হবে না তা তিনিও জানতেন। সমাজবাদ ও মার্ক্সবাদ গ্রহণ করলেই কবিতা লেখা যায় না। আইয়ুব মার্ক্সবাদী হয়েও সংকীর্ণচেতা নন। তাই যাঁরা সাহিত্যকে মেহনতী মানুষের বিষয় ভেবে Bourgeous, Facist, Spy, Comrade ইত্যাদি শব্দের বহুল প্রয়োগ ঘটান, তাঁর কাব্যকে অকাব্যই করেন। এই 'পাইকারি চালান' সাহিত্যে কাম্য হতে পারে না। আপেক্ষিকভাবে সব মানুষ সমান হবে, খাওয়া-পরা নিশ্চিত হবে—এই স্বপ্ন মার্ক্স দেখেছিলেন। বঙ্গদেশে তা বায়বীয় তত্ত্ব হওয়ায় গতি ও প্রগতি কিছুই ঘটেনি। আইয়ুব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন,

মার্কসের মতবাদ যখন বায়ুর উপরিস্তর থেকে
কঠিন ভূমিতলে নেমে আসবে....এক নতুন নি:শ্রেণীক
সভ্যতা চোখের সামনে রেখায় রেখায় ফুটে উঠবে।

তখনই বামপন্থী সাহিত্যিকরা সদর্থক ও মূর্ত প্রেরণা খুঁজে পাবেন। নচেৎ ভগবৎ বিশ্বাসীদের মতো এক ধরনের অন্ধত্ব মানুষকে দিশাহারা ও একচক্ষু হরিণ বানাবে। এক্ষেত্রে আইয়ুব হিউম্যানিজমকে মর্যাদা দিতে চান। যা অন্তত বিশ্বাসের সবুজ ভূমি রক্ষা করে।

'অবিশ্বাসের মরুভূমিতে রবীন্দ্রনাথ কখনো
আধুনিকদের মতো পদক্ষেপ করতে বাধ্য হননি।'

আবু সয়ীদ আইয়ুব ঠিকই বলেছেন। তবে মানুষ বলেই মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যেও অবসাদ-বিষাদ-মৃত্যুবোধ এসেছে। সন্দেহ-সংশয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন এটাও সত্য। 'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে' এতো তাঁরই অনুভব। মহাবিশ্বে মহাকাশে নিজেকে একা দেখে বিস্মিত, ভীত হয়েছেন। তাঁর গানে ও কবিতায় যার সাক্ষ্য মেলে।

১. জানি না কে আছে কিনা
সাড়া তো না পাই তার।

২. সকল পথের ঘোচে চিহ্ন
সকল বাঁধন যবে ছিন্ন
মৃত্যু আঘাত লাগে প্রাণে।

৩. তোমার বীণা কখনো শুনি
কখনো শুনি না যে

৪. পথে পথে ঘোরাও যদি
মরবো তবে মিথ্যে খোঁজে।

৫. আজ ভাবি মনে মনে মরীচিকা অন্বেষণে, হায়
বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই, মনে ভয় লাগে সেই—
হালভাঙা পালছেঁড়া ব্যথা চলছে নিরুদ্দেশে।
পথের শেষ কোথায়, কী আছে পথের শেষে?

তবু এটাই তাঁর মর্মকথা নয়। অন্তবিহীন পথ পাড়ি দিয়ে যখন গন্তব্যে তিনি পৌঁছান তখন তাঁর প্রাণে খুশির তুফান ওঠে। প্রাণমন দিয়ে গেয়ে ওঠেন, 'আমি কেমন করিয়া জানাব আমার

জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো।' পরাণবন্ধুর হাত জড়িয়ে ধরে নিশ্চিন্ত হতে চান কবি—

হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো দাও গো আমার হাতে,
আমি ধরব তারে, ভরব তারে রাখব তারে সাথে,
একলা পথের চলা আমার করব রমণীয়।

একালের কবিরা সেই বিশ্বাস ও নির্ভরতা দেখাতে পারেন না।

।। ৬।।

প্রসঙ্গত আইয়ুব টি.এস. এলিয়ট ও ডব্লু. বি. ইয়েটসকে রবীন্দ্রনাথের পাশে টেনে এনেছেন। The Waste Land কাব্যে এলিয়ট মরুচারী—It is the cactus land. যেমন বলেন, তেমনি দেখতে পান চরাচর dark and void. চারিদিকে শুধু পাথর, এককণা জলও নেই।—

Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road.

দেখেন মানুষেরা ফাঁকা ও ফাঁপা। তবু what is the thunder said পর্যায়ে এলিয়ট দেখান আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ। বৃষ্টি নামালো বলে। বিদ্যুৎ রেখায় দ-দ-দ ধ্বনি। উপনিষদে বলে যে 'দ'-র অর্থ তিনরকম। মানুষ বলে, দয়া করো; দানব বলে, দমন করো; দেবতা বলে, দান করো। অর্থাৎ এলিয়টও অবিশ্বাসের মরু ছেড়ে বিশ্বাসের সুধা-শ্যামলিম পারে এসেছেন। তাঁর কাব্যনাট্যগুলিতে ক্যাথলিক ধর্মের ছায়াতরু নির্মাণ করেছেন।

আর ইয়েটস্ আপাদমস্তক রোমান্টিক কবি ও প্রেমিক। মড গন তাঁর প্রেয়সী ও মানসী। তাঁর জন্য স্বধর্ম ত্যাগ করে বিপ্লবে যোগ দেন। আবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে দুর্গ কিনে বিয়ে করে সপরিবারে বসবাস করেন। যদিও এক জরাজয়ী যৌবন তাঁকে ঘিরে থাকে। প্রেমিকার পদতলে স্বপ্ন বিছিয়ে দেন। গায়ে সেই কোট পরেন, যা আইরিশ পুরাণ ও লোককাহিনী দিয়ে গাঁথা। যেতে চান সেই নির্জন সুন্দর ইনিসফ্রি দ্বীপে। যার শান্তশ্রী রবীন্দ্রনাথকে একদা মুগ্ধ করেছিল। ইয়েটস যদিও জানেন, 'All men live in suffering' তবু মরতে চান 'A foolish, psssionate man' হয়ে। রমণীর বক্ষোলগ্ন হওয়ার আনন্দ চান বারেবারে। বার্ধক্যকে তুচ্ছ করে জানান, আরও একবার যুবক হলে 'held her in my arms।' ভুলতে চান ক্ষত যত ক্ষতি যত 'upon a woman's breast'. ঘোষণা করেন, 'We were the last romantics'. প্রেমেই তাঁর বিশ্বাস ও উজ্জ্বল উদ্ধার। রূঢ় আর্ত জগৎ থেকে সরে গিয়ে ডুব দিতে চান স্বপ্নসায়রে। যা আইয়ুব মানতে পারেননি। একটু কড়া ভাষায় বলেছেন,

যেতে চান ইনিসফ্রি দ্বীপে প্রকৃতির কোলে। আধুনিক কালের বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় প্রাচীনযুগে পালানো নয়, আধুনিকতর যুগে এগোনো।

তবে সেই অগ্রগতি কীভাবে ঘটবে, কে ঘটাবে তিনি জানেন না। মানবধর্মে আস্থা যে রাখতে হবে, এটা নিয়ে তাঁর দ্বিধা নেই।

।। ৭।।

আধুনিক কবিতার ভবিতব্য কি মরুযাত্রী হওয়া? জীবন রুক্ষ, কঠিন, বাস্তবই থেকে যাবে? কোনো প্রিয়ার চোখের চাওয়ার হাওয়া দোলা দেবে না? কোনো শ্যামল বনভূমি ছায়া দেবে না? কবিতা কানে কানে শোনাবে না উজ্জীবনের বাণী? রোমান্টিক না-হলেই কি বিশ্বাস ভঙ্গ হবে? এমনতর প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আইয়ুব এক নতুন ভাবনা-প্রস্থান তৈরি করলেন। বললেন, আগের শ্যামলতা, কোমলতা যদি হারায়, হারিয়ে যাক। তার বদলে কবিরা পেয়েছে মরীচিকার বদলে তপ্ত মরুবালুরাশি। আর কবিতা?— 'কোমলতা হারিয়ে সে পেয়েছে মাংসপেশী, দৃঢ় নির্ভীক অঙ্গসঞ্চালন শক্তি'। সৌখিন মজদুরি আর ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলানোর দিন শেষ। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে

Scanned with CamScanner

রবীন্দ্রনাথও কড়া লাইন, খাড়া লাইন, নুরালজিয়ার ব্যথার মতো ভাষা সাহিত্যে চেয়েছিলেন। ইনিয়ে-বিনিয়ে পাতার পর পাতা কবিতা লেখা আর পাঠকেরা চান না। সময় অল্প। তুষ বা ফেনায় কারো আগ্রহ নেই। যা বলার সোজাসুজি বলতে হবে। 'কাব্যবস্তুকে পাৎলা করে দেওয়া' আধুনিকেরা চান না। এখন কবিতায় দরকার অত্যন্ত 'চোখা শব্দের অন্বেষণ, সবচেয়ে লাগসই উপমা ও চিত্রকল্পের প্রয়োগ', পদলালিত্য না-ই থাক, ব্যঞ্জনা যেন থাকে। স্পষ্ট করেই বলেন, 'কবিতা আজ বিশুদ্ধ হৃদয়াবেগের সীমানাও ছাড়িয়ে যেতে প্রস্তুত'। কাব্যের ভোজে আজ কিছুই অপাংক্তেয় নয়। উনিশ শতকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিতার পাত্রে তপ্‌সে মাছ, পাঁঠা, আনারস, পিঠেপুলি পরিবেষণ করেছিলেন। একালের কবিরা সামান্যকে অসামান্য করার দক্ষতা দেখান। তত্ত্বের প্যাঁচ বা রাজনীতির অনুজ্ঞা নিয়ে কবিরা চিন্তিত ও উৎসুক নন। কেউ কবিতায় ছন্দোবদ্ধ রূপগঠনে, অন্ত্যমিলের চমৎকারিত্বে চমকে দেন। কেউবা অচিন্তিতপূর্ব বিষয়ে তাঁর কবিতার উপাদান করে তোলেন। একটি উদাহরণ দিই। একজন প্রায় অখ্যাত কবি। দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় 'বেতন' নামে যে কবিতাটি লিখেছেন, তার অংশবিশেষ পুনরুদ্ধার করছি।—

কবে আসবে মাস পয়লা—মাসের পয়লা আসতে কত দেরি
আমি চাতকের মতো হা হা রব করি
কবে আসবে মাস পয়লা—বেজে উঠবে আমার পকেট
ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠবে হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্য নিয়ে, তার

* * * * *

মাসের প্রথম দিন আমার পকেটে
লজ্জা লজ্জা শুভদৃষ্টি জীবনে একবার—প্রতি মাসে
মাত্র পয়লা দিন এলে আমার পকেট হয়ে ওঠে
বাসরের রাত—

* * * * *

পয়লা তারিখের পর থেকে
আমার পকেট
ঝুলে পড়া
চামড়া নিয়ে, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ
রমণীর মতো
রামঠাকুরের
আশ্রম-চাতালে বসে কেবল কীর্তন শোনে—
ভজে হরিনাম।

(দ্র. শিলাদিত্য পত্রিকা / উৎসব সংখ্যা, ১৪২২)

আমার মনে হয়, আইয়ুব বেঁচে থাকলে এই কবিকে স্বাগত জানাতেন। লাগসই শব্দ, যথাযথ উপমা ও চিত্রকল্পে অত্যন্ত স্মার্ট এই কবিতা। কোথাও আবেগের মেদ নেই; বেগ ও প্রাণোত্তাপ আছে। আইয়ুবের ভাষায়—'কবিতা আজ সমস্ত গতানুগতিক সীমা ছাড়িয়ে চলেছে।'

তবে তাঁর প্রবন্ধের শেষে আইয়ুব আজকের লিরিক করিতায় খুঁজতে চেয়েছে ড্রামা ও এপিকের 'বিশালতা ও বৈচিত্র্য'। কেউ কেউ তা পেরেছেন বলেই তাঁর ধারণা। কবিতা নিয়ে পরীক্ষা চলবে। ছন্দ, অলঙ্কার, শব্দ, বাক্যবিন্যাস, মিল-অমিল কত কী। তবে শেষ পর্যন্ত কবিতালক্ষ্মীর প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য আইয়ুব চান কল্পনা ও অনুভূতির সঙ্গে মনকেও। যে 'মন'কে আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'ইহেমান্ গৃহাঁন্ উপজুজষাণ এহি'।

Scanned with CamScanner